কুরআনের মর্মকথা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

আমাদের কথা

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী পুর্ণজাগরণের নকীব শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন মরহুম সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনের পাঠ্যকগণ এর ভূমিকা আলাদা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার দাবী জানিয়ে আসছেন। মূলত বিভিন্ন কারণে এ দাবীটি গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা "কুরআনের মর্মকথা" নাম দিয়ে ভূমিকাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করলাম।

মাওলানা এখানে কুরআনের প্রকৃত পরিচয় এমন চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন যার ফলে এক নজরেই পাঠকের মন-মগজে কুরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেবার এক দুর্নিবার আকাংখা সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে মাওলানা এখানে কুরআন উপলব্ধির সঠিক ও বৈজ্ঞানিক পন্থা যথার্থভাবে তুলে ধরছেন। কুরআনের মর্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে এ এক অনন্য পুস্তিকা।

তাফহীমূল কুরআনের সহজ ও চলতি ভাষায় অনুবাদ করছেন জনাব আবদুল মান্নান তালিব। তাঁর অনুবাদই এখানে পত্রস্থ হলো।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী এ পুস্তিকাটি পাঠকগণের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহ্ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করছে। পুস্তিকাটির সাহায্যে তিনি পাঠকবর্গকে কুরআনের মর্ম উপলব্ধির তৌফিক দিন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

সূচিপত্র

প্রসংগ কথা

উলামা ও কুরআন গবেষকদের প্রয়োজন পূর্ণ করা এ তাফসীরটির উদ্দেশ্য নয়। অথবা আরবী ভাষা ও দ্বীনী তালীমের পাঠ শেষ করার পর যারা কুরআন মজীদের গভীর অনুসন্ধানমূলক অধ্যয়ন করতে চান তাদের জন্যও এটি লেখা হয়নি। ইতিপূর্বে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ তাদের এ প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম। এ তাফসীরটির মাধ্যমে আমি যাদের খেদমত করতে চাই তাঁরা হচ্ছেন মাঝারি পর্যায়ের শিক্ষিত লোক। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাদের তেমন কোনো দখল নেই। কুরআনী জ্ঞানের যে বিরাট ভান্ডার আমাদের এখানে গড়ে উঠেছে, তা থেকে লাভবান হবার সামর্থ ও যোগ্যতা তাদের নেই। সর্বাগ্রে তাদের প্রয়োজনই আমার সামনে রয়েছে। এ কারণে তাফসীর সংক্রান্ত অনেক গভীর তত্ত্ব-আলোচনায় আমি হাত দেইনি। ইল্‌মে তাফসীরের দৃষ্টিতে সেগুলো অত্যধিক গুরুত্ববহ কিন্তু এই শ্রেণীটির জন্য অপ্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমার সামনে রয়েছে সেটি হচ্ছে, একজন সাধারণ পাঠক যেন এ কিতাবটি পড়ার পর কুরআনের মূল বক্তব্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারেন। কুরআন তার ওপর যে ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে চায় এ কিতাবটি পড়ার পর তার ওপর যেন ঠিক তেমনি প্রভাব পড়ে। কুরআন পড়তে গিয়ে যেখানে তার মনে সন্দেহ-সংশয় জাগবে এবং প্রশ্ন ভেসে উঠবে সেখানে এ কিতাবটি সাথে সাথেই তার জবাব দিয়ে যাবে এবং সকল প্রকার সন্দেহের কালিমা মুক্ত করে তার মনের আকাশকে স্বচ্ছ, সুন্দর ও নির্মল করে তুলবে। সংক্ষেপে এতটুকু বলতে পারি, এটা আমার একটা প্রচেষ্টা এতে আমি কতটুকু সফল হয়েছি তা বিদগ্ধ পাঠকগণই বলতে পারবেন।

কুরআনের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাব প্রকাশ

কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি এখানে শাব্দিক অনুবাদের পদ্ধতি পরিহার করে স্বাধীন-স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাব প্রকাশের পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। এর পেছনে আমার শাব্দিক অনুবাদ পদ্ধতিকে ভুল মনে করার মতো কোনো ধারণা কার্যকর নেই। বরং মিল্লাতে ইসলামিয়ার বড় বড়

মনীষী এবং শ্রেষ্ঠ ইসলামী জ্ঞান সম্পন্ন আলেমগণ বিভিন্ন ভাষায় এ দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। তাই এ পথে নতুন করে অগ্রসর হবার তেমন কোনো প্রয়োজন আমি দেখিনি। তবে এমন কিছু প্রয়োজন আছে যা শাব্দিক অনুবাদে পূর্ণ হয় না এবং হতে পারে না। স্বাধীন-স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাব প্রকাশের মাধ্যমে আমি সেগুলোকে পূর্ণ করার চেষ্টা করেছি।

শাব্দিক অনুবাদের আসল লাভ হচ্ছে এই যে, পাঠক কুরআনের প্রতিটি শব্দের মানে জানতে পারে। প্রতিটি আয়াতের নীচে তার অনুবাদ পড়ে তার মধ্যে কি কথা বলা হয়েছে তা জানতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিটির এই লাভজনক দিকের সাথে এর মধ্যে এমন কিছু অভাব রয়ে গেছে যার ফলে একজন আরবী অনভিজ্ঞ পাঠক কুরআন মজীদ থেকে ভালোভাবে উপকৃত হতে পারে না।

১. শাব্দিক অনুবাদ পড়তে গিয়ে সর্ব প্রথম রচনার গতিশীলতা, বর্ণনার শক্তি, ভাষার অলংকারিত্ব ও বক্তব্যের প্রভাব বিস্তারকারী ক্ষমতার অভাব অনুভূত হয়। কুরআনের প্রতিটি ছত্রের নীচে শাব্দিক অনুবাদের আকারে পাঠক এমন একটি নিষ্প্রাণ রচনার সাথে পরিচিত হয়, যা পড়ার পর তার প্রাণ নেচে ওঠে না, গায়ের পশম খাড়া হয়ে যায় না, চোখ দিয়ে অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হয় না এবং তার আবেগের সমুদ্রে তরংগও সৃষ্টি হয় না। কতকগুলো নিষ্প্রাণ বাক্য পড়ার পর সে মোটেও অনুভব করে না যে, কোনো বস্তু তার বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তিকে জয় করে হৃদয় ও মনের গভীরে নেমে যাচ্ছে। এই ধরনের কোনো প্রতিক্রিয়া হওয়া তো দূরের কথা বরং অনুবাদ পড়ার সময় অনেক সময় মানুষ ভাবতে থাকে, এটি কি সেই গ্রন্থ যার একটি বাক্যের অনুরূপ একটি বাক্য রচনা করার জন্য সারা দুনিয়াবাসীকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল? এর কারণ, শাব্দিক অনুবাদ সব সময় নীরস হয়। এর মাধ্যমে মূল বিষয়ের রসাস্বাদন কোনো ক্রমেই সম্ভব হয় না। কুরআনের মূল রচনার প্রতিটি বাক্য যে গভীর সাহিত্য রসে সমৃদ্ধ অনুবাদে তার সামান্যতম অংশও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। অথচ কুরআনের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে তার পবিত্র ও নিষ্কলুষ শিক্ষা এবং তার উন্নত বিষয়বস্তুর অবদান যতটুকু তার সাহিত্যের অবদানও সে তুলনায় মোটেই কম নয়। কুরআনের এই বস্তুটিই তো পাষাণ হৃদয় মানুষের দিলও মোমের মতো নরোম করে দেয়। এটিই বজ্রপাতের মতো আরবের সমগ্র ভূখন্ডকে কাঁপিয়ে তোলে। এর চরম শত্রুরাও এর প্রভাব বিস্তারের যাদুকরী

ক্ষমতার স্বীকৃতি দিতো। তারা এর ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকতো। কারণ তারা মনে করতো, যে ব্যক্তি একবার এই যাদুকরী বাণী শুনবে সে এই বাণীর কাছে তার হৃদয়-মন বিক্রি করে বসবে। কুরআনের মধ্যে যদি এই সাহিত্যের অলংকার না থাকতো এবং অনুবাদের ভাষার মতো নীরস ও অলংকারহীন ভাষায় তা নাযিল হতো, তাহলে কুরআনের পরশে আরববাসীদের হৃদয় কোনো দিন উত্তপ্ত হতো না, কোনো দিন তাদের দিল নরোম হতো না।

২. শাব্দিক অনুবাদ প্রভাবহীন হবার আর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, সাধারণত এই অনুবাদ মূলের প্রতিটি লাইনের নীচে বসানো হয়। অথবা নতুন ষ্টাইল অনুযায়ী পাতাকে মাঝখান থেকে ডানে বামে দুভাগে ভাগ করে একদিকে আল্লাহর কালাম এবং অন্যদিকে তার অনুবাদ বসানো হয়। শাব্দিক অনুবাদ পড়ার ও শেখার জন্য এ ব্যবস্থা তো ভালই। কিন্তু অন্যান্য বই একনাগাড়ে পড়ে মানুষ যেমন প্রভাবিত হয় এখানে তেমনটি হওয়া সম্ভবপর হয় না। কারণ এখানে ধারাবাহিকভাবে একটি বক্তব্য পড়ার সুযোগ নেই। বার বার মাঝখানে অন্য একটি অপরিচিত ভাষা এসে যাচ্ছে। কাজেই অনুবাদের বক্তব্য বার বার হোঁচট খেয়ে যাচ্ছে। ইংরেজী অনুবাদগুলোয় এর চাইতেও বেশি প্রভাবহীনতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। কারণ সেখানে বাইবেলের অনুকরণে কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতের অনুবাদ নম্বর ভিত্তিক করা হয়েছে। আপনি কোনো একটি চমৎকার প্রবন্ধের প্রত্যেকটি বাক্য আলাদা করে লিখুন। তারপর ওপরে নীচে তার গায়ে নম্বর লাগিয়ে পড়ুন। আপনি নিজেই অনুভব করবেন, সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিকভাবে লিখিত রচনাটি যেভাবে আপনাকে প্রভাবিত করতো, এই পৃথক পৃথক বাক্যগুলোর জন্য তার অর্ধেক প্রভাবও আপনার ওপর পড়েনি।

৩. শাব্দিক অনুবাদের প্রভাবহীন হবার তৃতীয় একটি বড় কারণ হচ্ছে এই যে, কুরআন একটি রচনার আকারে নয় বরং ভাষণের আকারে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই ভাষান্তরিত করার সময় বক্তৃতার ভাষাকে যদি রচনার ভাষায় রূপান্তরিত না করা হয় এবং যেখানে যেমন আছে ঠিক তেমনটি রেখে হুবহু অনুবাদ করা হয় তাহলে সমস্ত রচনাটিই অসংলগ্ন এবং বক্তব্যগুলো পারস্পরিক সম্পর্কহীন হয়ে পড়বে।

৪. সবাই জানেন, কুরআন মজীদ শুরুতে লিখিত পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়নি। বরং ইসলামী দাওয়াত প্রসংগে প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী একটি ভাষণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করা হতো এবং তিনি ভাষণ আকারে তা লোকদের শুনিয়ে দিতেন। প্রবন্ধের ভাষা ও বক্তৃতার ভাষার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে অনেক পার্থক্য থাকে। যেমন প্রবন্ধ লেখার সময় পাঠক সামনে থাকে না। তাই সেখানে কোনো সংশয়ের উল্লেখ করে তার জবাব দেয়া হয়। কিন্তু বক্তৃতার সময় শ্রোতা তথা সংশয়ী নিজেই সামনে হাযির থাকে। তাই সেখানে সাধারণত এভাবে বলার প্রয়োজন হয় না যে, "লোকেরা একথা বলে থাকে।" বরং বক্তা তার বক্তৃতার মাঝখানে প্রসঙ্গক্রমে এমন একটি কথা বলে যায় যা সন্দেহ পোষণকারীর সন্দেহ দূর করতে সাহায্য করে। প্রবন্ধের বেলায় বক্তব্যের বাইরে কিন্তু তার সাথে নিকট সম্পর্ক রাখে এমন কোনো কথা বলতে হলে তাকে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করে কোনো না কোনোভাবে প্রবন্ধের মূল বক্তব্য থেকে আলাদা করে লিখতে হয় যাতে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ক্ষুন্ন না হয়। অন্যদিকে বক্তৃতার মধ্যে শুধুমাত্র বক্তৃতার ধরণ ও ভংগি পরিবর্তন করে একজন বক্তা বিরাট বিরাট প্রাসংগিক বক্তব্য বলে যেতে পারেন। শ্রোতারা এই বক্তব্যের মধ্যে কোথাও সম্পর্কহীনতা খুঁজে পাবে না। প্রবন্ধে পরিবেশের সাথে বক্তব্যের সম্পর্ক জোড়ার জন্য শব্দের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বক্তৃতায় পরিবেশ নিজেই বক্তব্যের সাথে নিজের সম্পর্ক জুড়ে নেয়। সেখানে পরিবেশের দিকে ইংগিত না করেই যেসব কথা বলা হয় তাদের মধ্যে কোনো শূন্যতা অনুভূত হয় না। বক্তৃতায় বক্তা ও শ্রোতার বারবার পরিবর্তন হয়। বক্তা নিজের শক্তিশালী বক্তব্যের মাধ্যমে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনো একটি দলের উল্লেখ করে তৃতীয় পুরুষ হিসেবে। কখনো তাকে মধ্যম পুরুষ হিসেবে উপস্থাপিত করে সরাসরি সম্বোধন করে। কখনো বক্তব্য পেশ করে এক বচনে আবার কখনো বহু বচন ব্যবহার করতে থাকে। কখনো বক্তা নিজেই সরাসরি বলতে থাকে, আবার কখনো অন্যের পক্ষ থেকে বলতে থাকে। কখনো সে উচ্চতর ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে, আবার কখনো সেই উচ্চতর ক্ষমতা নিজেই তার মুখ দিয়ে বলতে থাকে। এ জিনিসটি বক্তৃতায় একটি সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রবন্ধে এসে এটি সম্পূর্ণ একটি অসম্পর্কিত বস্তুতে পরিণত হয়। এ কারণে কোনো বক্তৃতাকে প্রবন্ধ আকারে লিখলে পড়ার সময় তার

মধ্যে বেশ সম্পর্কহীনতা অনুভূত হতে থাকে। মূল বক্তৃতার পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে পাঠকের দূরত্ব যতই বাড়তে থাকে এই সম্পর্কহীনতার অনুভূতিও ততই বাড়তে থাকে। অজ্ঞ লোকেরা কুরআন মজীদে যে অসংলগ্নতার অভিযোগ করে তার ভিত্তিও এখানেই। সেখানে ব্যাখ্যামূলক টীকার মাধ্যমে বক্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কারণ কুরআনের আসল বাক্যের মধ্যে কোনো প্রকার কমবেশী করা হারাম। কিন্তু অন্য কোনো ভাষায় কুরআনের অর্থ প্রকাশ করার সময় বক্তৃতার ভাষাকে সতর্কতার সাথে প্রবন্ধের ভাষায় রূপান্তরিত করে অতি সহজে এই অসংলগ্নতা দূর করা যেতে পারে।

৫. কুরআন মজীদের সূরাগুলি আসলে ছিল এক একটি ভাষণ। ইসলামী দাওয়াতের বিশেষ একটি পর্যায়ে একটি বিশেষ সময়ে প্রতিটি সূরা নাযিল হয়েছিল। প্রতিটি সূরা নাযিলের একটি প্রেক্ষাপট ছিল। কিছু বিশেষ অবস্থায় এই ধরনের বক্তব্যের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল। কিছু প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তখন এগুলো নাযিল হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপট ও নাযিলের উপলক্ষের সাথে কুরআনের সূরাগুলো এত গভীর সম্পর্কযুক্ত যে, সেগুলো থেকে আলাদা হয়ে নিছক শাব্দিক অনুবাদ কারোর সামনে রাখা হলে অনেক কথা সে একেবারেই বুঝতে পারবে না। আবার অনেক কথার উল্টো অর্থ বুঝবে। কুরআনের পূর্ণ বক্তব্য সম্ভবত কোথাও তার আয়ত্তাধীন হবে না। আরবী কুরআনের ক্ষেত্রে এই সমস্যা দূর করার জন্য তাফসীরের সাহায্য নিতে হয়। কারণ মূল কুরআনের কোন কিছু বৃদ্ধি করা যেতে পারে না। কিন্তু অন্য ভাষায় কুরআনের ভাব প্রকাশ করার সময় আমরা আল্লাহর কালামকে তার প্রেক্ষাপট ও নাযিলের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত করতে পারি। এভাবে পাঠক তার পরিপূর্ণ অর্থ গ্রহণ করতে পারবে।

৬. কুরআন সহজ সরল আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হলেও সেখানে একটি বিশেষ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন প্রচলিত শব্দকে তার আভিধানিক অর্থে ব্যবহার না করে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার বিভিন্ন শব্দকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছে। শাব্দিক অনুবাদ করার সময় তার মধ্যে এই পারিভাষিক ভাষার ভাবধারা ফুটিয়ে তোলা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এই ভাবধারা ফুটিয়ে না তোলা হলে অনেক সময় পাঠকরা বিভিন্ন সংকট ও ভুল ধারনার সম্মুখীন হয়। যেমন কুরআনে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ হচ্ছে "কুফর"। কুরআনে এ শব্দটি যে পারিভাষিক

অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মূল আরবী অভিধানে এবং আমাদের ফকীহ্ ও ন্যায় শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় ব্যবহৃত অর্থের সাথে তার কোনো মিল নেই। আবার কুরআনেও সর্বত্র এটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কোথাও এর অর্থ পরিপূর্ণ ঈমানবিহীন অবস্থা। কোথাও এর অর্থ নিছক অস্বীকার। কোথাও একে অকৃতজ্ঞতা ও উপকার ভুলে যাওয়ার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোথাও ঈমানের বিভিন্ন দাবীর মধ্য থেকে কোন দাবী পূরণ না করাকে কুফরী বলা হয়েছে। কোথাও আকীদাগত স্বীকৃতি কিন্তু কর্মগত অস্বীকৃতি বা নাফরমানী অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কোথাও বাহ্যিক আনুগত্য কিন্তু প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাসকে কুফরী বলা হয়েছে। এ ধরনের বিভিন্ন জায়গায় যদি আমরা 'কুফরী' শব্দের অর্থ 'কুফরী' লিখে যেতে থাকি বা এর কোনো একটি প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে থাকি তাহলে নিঃসন্দেহে অনুবাদ সঠিক হবে। কিন্তু পাঠকগণ কোথাও এর সঠিক অর্থ থেকে বঞ্চিত থাকবেন, কোথাও তারা ভুল ধারণার শিকার হবেন, আবার কোথাও সন্দেহ-সংশয়ের সাগরে হাবুডুবু খাবেন।

শাব্দিক অনুবাদের পদ্ধতিতে এই ত্রুটি ও অভাবগুলো দূর করার জন্য আমি মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাবার্থ প্রকাশের পথ বেছে নিয়েছি। কুরআনের শব্দাবলীকে ভাষান্তরিত করার পরিবর্তে কুরআনের একটি বাক্য পড়ার পর তার যে অর্থ আমার মনে বাসা বেঁধেছে এবং মনের ওপর তার যে প্রভাব পড়েছে, তাকে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি। লেখ্য ভাষায় স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভাষণের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরেছি। আল্লাহর কালামের অর্থ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ দ্ব্যর্থহীনভাবে সুস্পষ্ট করার সাথে সাথে তার রাজকীয় মর্যাদা ও গাম্ভীর্য এবং ভাব প্রকাশের প্রচন্ড শক্তিকে যথাসম্ভব উপস্থাপন করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এই ধরনের মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদের জন্য শব্দের শৃংখলে বন্দী না থেকে মূল অর্থ ও তাৎপর্য প্রকাশের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা চালানোই ছিল অপরিহার্য। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর কালামের ব্যাপার, সেজন্য আমি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে এপথে পা বাড়িয়েছি। আমার পক্ষ থেকে যতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব তা করেছি। কুরআন তার বক্তব্যকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যতটুকু স্বাধীনতা দেয় তার সীমা অতিক্রম করার চেষ্টা করিনি।

আবার কুরআনকে পুরোপুরি বুঝার জন্য তার প্রতিটি বাণীর পটভূমি পাঠকের সামনে থাকা প্রয়োজন। মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ এবং ভাবার্থ প্রকাশের মাধ্যমে তা পুরোপুরি সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি সূরার শুরুতে আমি একটি ভূমিকা সংযুক্ত করেছি। সেখানে সম্ভাব্য সকল প্রকার অনুসন্ধান চালিয়ে আমি বিভিন্ন বিষয় নির্দিষ্ট ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। যেমন, সংশ্লিষ্ট সূরাটি কোন্ সময় নাযিল হয়েছিল! তখন কি অবস্থা ছিল? ইসলামী আন্দোলন তখন কোন পর্যায়ে ছিল? তার প্রয়োজন ও চাহিদা কি ছিল? সে সময় কোন্ কোন্ সমস্যা দেখা দিয়েছিল? এ ছাড়াও কোথাও কোনো বিশেষ আয়াতের অথবা আয়াত সমষ্টির নাযিলের কোনো পৃথক উপলক্ষ থাকলে সেখানেই টীকার মধ্যে তা বলে দিয়েছি। টীকায় এমন কোনো কথা আমি আলোচনা করিনি যার ফলে পাঠকের দৃষ্টি কুরআন থেকে সরে গিয়ে অন্যদিকে চলে যেতে পারে। যেখানে আমি অনুভব করেছি সাধারণ পাঠক এখানে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ চান অথবা তার মনে কোনো প্রশ্ন দেখা দেবে বা তিনি কোনো সন্দেহ-সংশয়ের শিকার হবেন, সেখানে আমি টীকা লিখেছি এবং ব্যাখ্যা সংযোজন করেছি। আবার যেখানে আমার মনে আশংকা জেগেছে যে পাঠক এখানে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে সোজা এগিয়ে যাবে এবং কুরআনের বাণীর মর্মার্থ তার কাছে অস্পষ্ট থেকে যাবে সেখানে আমি টীকা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিষয়টি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছি।

যারা এই কিতাবটি থেকে ফায়দা হাসিল করতে চান তাদেরকে আমি কয়েকটি পরামর্শ দেবো। প্রথমে সূরার শুরুতে সংযোজিত ভূমিকা তথা প্রসংগ ও পূর্ব আলোচনাটি গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ে নিন। যতক্ষণ ঐ সূরাটি অধ্যয়ন করতে থাকেন ততক্ষণ মাঝে মাঝে ঐ ভূমিকাটি দেখতে থাকেন। তারপর প্রতিদিন নিয়মিতভাবে কুরআন মজীদের যতটুকু পড়েন তার প্রতিটি আয়াতের শাব্দিক অনুবাদ প্রথমে পড়ে নিন। এ উদ্দেশ্যে মাতৃভাষায় বা অন্য যে কোনো ভাষায় আপনার পছন্দসই যে কোনো অনুবাদের সাহায্য নিন। এটুকু হয়ে যাবার পর তাফহীমুল কুরআনের স্বচ্ছন্দ অনুবাদটি ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে যতদূর প্রয়োজন একটি ধারাবাহিক রচনার মতো পড়ে নিন। এভাবে কুরআনের ঐ অংশের বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য একই সময় আপনার মনে ভেসে উঠবে। এরপর প্রত্যেকটি আয়াতকে বিস্তারিতভাবে বুঝার জন্য টীকা ও ব্যাখ্যা পড়তে থাকুন। এভাবে পড়তে থাকলে আমি মনে করি একজন সাধারণ পাঠক

কুরআন মজীদ সম্পর্কে একজন আলেমের সমপর্যায়ে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম না হলেও একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে ইনশাআল্লাহ্ যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

আমি ১৩৬১ হিজরীর মুহররম (ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ খৃঃ) মাসে এ গ্রন্থের কাজ শুরু করি। ৫ বছরের অধিককাল ক্রমাগত এ কাজ চালু থাকে এবং সূরা ইউসূফ-এর তরজমা ও ব্যাখ্যা পর্যন্ত হয়ে যায়। অতঃপর এমন কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যে পরিস্থিতিতে আমার না কিছু লেখার সুযোগ হয়েছে আর না এমন অবকাশ হয়েছে যে, পূর্বের কাজটুকু দ্বিতীয়বার দেখে গ্রন্থাকারে প্রকাশের উপযুক্ত করে তুলতে পারি। একে সৌভাগ্যই বলুন অথবা দুর্ভাগ্য, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হঠাৎ এমন সুযোগ এসে গেল যে, আমাকে জন নিরাপত্তা আইনে (Public Safety Act) গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হলো, আর এখানেই আমি সে অবকাশ পেয়ে গেলাম, যা এ গ্রন্থকে প্রকাশের উপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল। আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করি যেন আমার শ্রমের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং আল্লাহর বান্দাদের কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ সহায়ক প্রমাণিত হয়।

আবুল আ'লা

নিউ সেন্ট্রাল জেল, মুলতান
১৭ যিলকদ ১৩৬৮ হিঃ
(১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ খৃঃ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুরআনের মর্মকথা[১]

শিরোনামে 'ভূমিকা' শব্দটি দেখে আমি কুরআন মজীদের ভূমিকা লিখতে বসে গেছি বলে ভুল ধারণা করার কোনো কারণ নেই। এটা কুরআনের নয় বরং তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা। দুটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমি এ ভূমিকা লেখায় হাত দিয়েছি।

এক, কুরআন অধ্যয়নের আগে একজন সাধারণ পাঠককে এমন কিছু কথা ভালভাবে জেনে নিতে হবে যেগুলো শুরুতেই জেনে নিলে তার পক্ষে কুরআনের বক্তব্য অনুধাবন করা সহজ হয়ে যায়। নয়তো কুরআন অধ্যয়নের মাঝখানে বারবার এ কথাগুলো তার মনে সন্দেহ সঞ্চার করতে পারে। অনেক সময় শুধুমাত্র এগুলো না বুঝার কারণে মানুষ কুরআনের অন্তর্নিহিত অর্থের কেবলমাত্র উপরিভাগে ভাসতে থাকে বছরের পর বছর ধরে। ভেতরে প্রবেশ করার আর কোনো পথই খুঁজে পায় না।

দুই, কুরআন বুঝার চেষ্টা করার সময় মানুষের মনে যে প্রশ্নগুলোর উদয় হয় সর্ব প্রথম সেগুলোর জবাব দিতে হবে। এ ভূমিকায় আমি কেবলমাত্র এমন প্রশ্নের জবাব দেবো যেগুলো প্রথম প্রথম আমার মনে জেগেছিল অথবা পরে আমার সামনে আসে।

কুরআন পাঠকের সংকট

সাধারণত আমরা যেসব বই পড়ে থাকি তাতে থাকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু। একটি বিশেষ রচনাশৈলীর আওতায় এ বিষয়বস্তুর ওপর ধারাবাহিকভাবে তথ্য সরবরাহ করা হয় এবং বিভিন্ন মতামত ও যুক্তির অবতারণা করা হয়। এজন্য কুরআনের সাথে এখনো পরিচয় হয়নি এমন কোনো ব্যক্তি যখন প্রথমবার এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে যান তখন তিনি একটি চিরাচরিত আশা নিয়েই এগিয়ে যান। তিনি মনে করেন, সাধারণ গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থেও প্রথমে বিষয়বস্তু নির্ধারিত থাকবে, তারপর মূল আলোচ্য বিষয়কে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে বিন্যাসের ক্রমানুসারে

---

১. মূলত এখানে শিরোনাম ছিল 'ভূমিকা', অর্থাৎ তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা।

এক একটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হবে। এভাবে জীবনের এক একটি বিভাগকে আলাদা আলাদাভাবে নিয়ে সে সম্পর্কে পূর্বোক্ত বিন্যাসের ক্রমানুসারে বিধান ও নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ থাকবে। কিন্তু গ্রন্থটি খুলে পড়া শুরু করার পর তিনি দেখেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্র। তিনি এখানে দেখেন এমন একটি বর্ণনাভংগি যার সাথে ইতিপূর্বে তার কোনো পরিচয় ছিল না। এখানে তিনি দেখেন আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়াবলী, নৈতিক বিধি-নির্দেশ, শরীয়তের বিধান, দাওয়াত, উপদেশ, সতর্কবাণী, সমালোচনা-পর্যালোচনা, নিন্দা-তিরস্কার, ভীতি প্রদর্শন, সুসংবাদ, সান্ত্বনা, যুক্তি-প্রমাণ, সাক্ষ এবং ঐতিহাসিক কাহিনী ও প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রতি ইংগিত। এগুলো বার বার একের পর এক আসছে। একই বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন শব্দের মোড়কে পুনর্ব্যক্ত করা হচ্ছে। একটি বিষয়বস্তুর পর আর একটি এবং তারপর আকাঙ্খিতভাবে তৃতীয় আর একটি বিষয়বস্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে। বরং কখনো কখনো একটি বিষয়বস্তুর মাঝখানে দ্বিতীয় একটি বিষয়বস্তু অকস্মাৎ লাফিয়ে পড়ছে। বাক্যের প্রথম পুরুষ ও দ্বিতীয় পুরুষের দিক পরিবর্তন হচ্ছে বার বার এবং বক্তব্য বার বার মোড় পরিবর্তন করছে। বিষয়বস্তুগুলোকে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করার কোনো চিহ্নও কোথাও নেই। ইতিহাস লেখার পদ্ধতিতে কোথাও ইতিহাস লেখা হয়নি। দর্শন ও অতিপ্রাকৃতিক বিষয়াবলীকে ন্যায় শাস্ত্র ও দর্শনের ভাষায় লেখা হয়নি। মানুষ ও বিশ্ব জাহানের বস্তু ও পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু জীব বিদ্যা ও পদার্থ বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে করা হয়নি। সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। আইনগত বিধান ও আইনের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে আইনবিদদের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে। নৈতিকতার যে শিক্ষা বিবৃত হয়েছে তার বর্ণনা ভংগি নৈতিক দর্শন সম্পর্কিত বইপত্রে আলোচিত বর্ণনাভংগি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সাধারণভাবে বইপত্রে যেভাবে লেখা হয় এসব কিছুই তার বিপরীত। এ দৃশ্য একজন পাঠককে বিব্রত করে। তিনি মনে করতে থাকেন, এটি একটি অবিন্যস্ত, অসংলগ্ন ও বিক্ষিপ্ত বক্তব্যের সমষ্টি। এখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য 'খন্ড রচনা' একত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে এগুলোকে ধারাবাহিক রচনা আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বিরোধিতার দৃষ্টিতে কুরআন অধ্যয়নকারীরা এরি ওপর রাখেন তাদের সকল আপত্তি, অভিযোগ ও সন্দেহ সংশয়ের ভিত্। অন্যদিকে অনুকূল দৃষ্টিভংগীর অধিকারীরা কখনো অর্থের দিক থেকে চোখ বন্ধ করে সন্দেহ সংশয় থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন। কখনো কখনো তার এই আপাত অবিন্যস্ত উপস্থাপনার ব্যাখ্যা করে নিজেদের মনকে বুঝাতে সক্ষম হন। কখনো কৃত্রিম পদ্ধতিতে যোগসূত্র অনুসন্ধান করে অদ্ভুত ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। আবার কখনো খন্ড রচনার' মতবাদটি গ্রহণ করে নেন, যার ফলে প্রত্যেকটি আয়াত তার পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে আলাদা হয়ে বক্তার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী অর্থ প্রকাশ করতে থাকে।

আবার একটি বইকে ভালোভাবে বুঝতে হলে পাঠককে জানতে হবে তার বিষয়বস্তু উদ্দেশ্য-লক্ষ, মূল বক্তব্য ও দাবী এবং তার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। সেই সাথে তার বর্ণনা পদ্ধতির সাথেও পরিচিত হতে হবে। তার পরিভাষা ও বিশেষ বিশ্লেষণ রীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। শব্দের উপরি কাঠামোর পেছনে তার বর্ণনাগুলো যেসব অবস্থা ও বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্কিত সেগুলোও চোখের সামনে থাকতে হবে। সাধারণত যেসব বই আমরা পড়ে থাকি তার মধ্যে এগুলো সহজেই পাওয়া যায়। কাজেই তাদের বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করা আমাদের জন্য মোটেই কঠিন হয় না। কিন্তু অন্যান্য বইতে আমরা এগুলো যেভাবে পেতে অভ্যস্ত কুরআনে ঠিক সেভাবে পাওয়া যায় না। তাই একজন সাধারণ বই পাঠকের মানসিকতা নিয়ে যখন আমাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করতে থাকেন তখন তিনি খুঁজে পান না এই কিতাবের বিষয়বস্তু, মূল বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। এর বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিও তার কাছে নতুন ও অপরিচিত মনে হয়। অধিকাংশ জায়গায় এর বাক্য ও বক্তব্যগুলোর পটভূমিও তার চোখের আড়ালে থাকে। ফলে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন আয়াতের মধ্যে জ্ঞানের যে উজ্জ্বল মুক্তোমালা ছড়িয়ে রয়েছে তা থেকে কম বেশী কিছুটা লাভবান হওয়া সত্ত্বেও পাঠক আল্লাহর কালামের যথার্থ অন্তরনিহিত প্রাণসত্তার সন্ধান পায় না। এক্ষেত্রে কিতাবের জ্ঞান লাভ করার পরিবর্তে তাকে নিছক কিতাবের কতিপয় বিক্ষিপ্ত তত্ত্ব ও উপদেশাবলী লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বরং কুরআন অধ্যয়নের পর যেসব লোকের মনে নানা কারণে সন্দেহ জাগে তাদের অধিকাংশের বিভ্রান্তির একটি কারণ হচ্ছে এই যে, কুরআনের বক্তব্য অনুধাবন করার

ব্যাপারে এই মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো তাদের জানা থাকে না। এরপরও কুরআন পড়তে গিয়ে তারা দেখে তার পাতায় পাতায় বিভিন্ন বিষয়বস্তু ছড়িয়ে আছে। বহু আয়াতের গভীর অর্থ তাদের কাছে অনুদ্ঘাটিত থেকে গেছে। অনেকগুলো আয়াতের মধ্যে তারা জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেয়েছে কিন্তু আয়াতের পূর্বাপর আলোচনার প্রেক্ষিতে এই বক্তব্য তাদের কাছে সম্পূর্ণ বেমানান মনে হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও বর্ণনা ভংগির সাথে অপরিচিত থাকার কারণে আয়াতের আসল অর্থ থেকে তারা অন্যদিকে সরে গিয়েছে এবং অধিকাংশ স্থানে পটভূমি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে এভাবে তারা মারাত্মক ধরণের বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে।

সংকট উত্তরণের উপায়

কুরআন কোন ধরণের কিতাব? এটি কিভাবে অবতীর্ণ হলো? এর সংকলন ও বিন্যাসের পদ্ধতি কি ছিল? এর বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয় কি? কোন্ বক্তব্য ও লক্ষবিন্দুকে ঘিরে এর সমস্ত আলোচনা আবর্তিত হয়েছে? কোন্ কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সাথে এর অসংখ্য বিভিন্ন পর্যায়ের বিষয়াবলী সম্পর্কিত? নিজের বক্তব্য উপস্থাপন ও সপ্রমাণ করার জন্য এতে কোন্ ধরনের বর্ণনা ধারা ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে? এই প্রশ্নগুলোর এবং এই ধরনের আরো কিছু প্রয়োজনীয় প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব যদি পাঠক শুরুতেই পেয়ে যান তাহলে তিনি বহুবিধ আশংকা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। তার জন্য কুরআনের অর্থ অনুধাবন ও তার মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করার পথ প্রশস্ত হয়ে যেতে পারে। যে ব্যক্তি কুরআন মজীদে প্রচলিত গ্রন্থের ন্যায় রচনা বিন্যাসের সন্ধান করেন এবং এর পাতায় তার সাক্ষাত না পেয়ে চতুর্দিকে হাতড়াতে গিয়ে অস্থির হয়ে পড়েন, কুরআন সম্পর্কিত এ মৌলিক প্রশ্নগুলির জবাব জানা না থাকাই তার মানসিক অস্থিরতার মূল কারণ। 'ধর্ম সম্পর্কিত' একটি বই পড়তে যাচ্ছেন- এই ধারণা নিয়ে তিনি কুরআন পড়তে শুরু করেন। 'ধর্ম সম্পর্কিত' এবং 'বই' এ দুটোর ব্যাপারে তার মনে সাধারণত ধর্ম ও বই সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাই বিরাজ করতে থাকে। কিন্তু যখন সেখানে নিজের মানসিক ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চিত্র তিনি দেখতে পান তখন তাঁর কাছে সেটি সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হতে থাকে। আলোচ্য বিষয়ের মূল কথার নাগাল না পাওয়ার কারণে

প্রতিটি বাক্যের মধ্যে তিনি এমনভাবে বিভ্রান্তের মতো ঘোরাফেরা করতে থাকেন যেন মনে হয় তিনি কোনো নতুন শহরের গলি পথে পথহারা এক নবাগত পথিক। এই পথ হারার বিভ্রান্তি থেকে তিনি বাঁচতে পারেন যদি তাঁকে পূর্বাহ্নেই এ কথা বলে দেয়া হয় যে, আপনি যে কিতাবটি পড়তে যাচ্ছেন সেটি বইপত্রের জগতে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অভিনব বই। এটির রচনা পদ্ধতিও স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্টমন্ডিত। বিষয়বস্তু, বক্তব্য বিষয় ও আলোচনা বিন্যাসের দিক দিয়েও এখানে সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। কাজেই এতদিন পর্যন্ত নানা ধরনের বইপত্র পড়ে আপনার মনে বই সম্পর্কে যে একটি কাঠামোগত ধারণা গড়ে উঠেছে, এ কিতাবটি বুঝার ব্যাপারে তা আপনার কোনো কাজে লাগবে না। বরং উল্টো এ ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। একে বুঝতে হলে নিজের মনের মধ্যে আগে থেকেই যেসব ধারণা ও কল্পনা বাসা বেঁধে আছে সেগুলোকে সরিয়ে দিতে হবে এবং এই কিতাবের অভিনব বৈশিষ্টকে নিজের মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে।

এ প্রসংগে পাঠককে সর্বপ্রথম মূল কুরআনের সাথে পরিচিত হতে হবে। এর প্রতি তার বিশ্বাস থাকা না থাকার প্রশ্ন এখানে নেই। তবে এ কিতাবকে বুঝতে হলে প্রারম্ভিক সূত্র হিসেবে এ কিতাব নিজে এবং এর উপস্থাপক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মূল বিবৃত করেছেন তা গ্রহণ করতে হবে। এ মূল বিষয় নিম্নরূপ ঃ

১. সমগ্র বিশ্ব জাহানের প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও একচ্ছত্র শাসক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ এ পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে দান করেছেন জানার, বুঝার ও চিন্তা করার ক্ষমতা। ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার, নির্বাচন, ইচ্ছা ও সংকল্প করার এবং নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করার স্বাধীনতা দান করেছেন। এক কথায় মানুষকে এক ধরনের স্বাধীনতা (Autonomy) দান করে তাকে দুনিয়ায় নিজের খলীফা বা প্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত করেছেন।

২. মানুষকে এই পদে নিযুক্ত করার সময় বিশ্ব জাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের মনে এ কথা দৃঢ় বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেনঃ আমিই তোমাদের এবং সমগ্র সৃষ্টিলোকের একমাত্র মালিক, মাবুদ ও প্রভু। আমার এই সাম্রাজ্যে তোমরা স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী নও, কারোর অধীনও নও এবং

আমার ছাড়া আর কারোর তোমাদের বন্দেগী, পূজা ও আনুগত্য লাভের অধিকারও নেই। দুনিয়ার এই জীবনে তোমাদেরকে কিছু স্বাধীন ক্ষমতা-ইখতিয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এটি আসলে তোমাদের জন্য পরীক্ষাকাল। এই পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে তোমাদের আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তোমাদের কাজগুলো যাচাই বাছাই করে আমি সিদ্ধান্ত নেবো তোমাদের মধ্য থেকে কে সফল হলো এবং কে হলো ব্যর্থ। তোমাদের জন্য সঠিক কর্মনীতি একটিই ঃ তোমরা আমাকে মেনে নেবে তোমাদের একমাত্র মাবুদ ও শাসক হিসেবে। আমি তোমাদের জন্য যে বিধান পাঠাবো সেই অনুযায়ী তোমরা দুনিয়ায় কাজ করবে। দুনিয়াকে পরীক্ষাগৃহ মনে করে এই চেতনা সহকারে জীবন যাপন করবে যেন আমার আদালতে শেষ বিচারে সফলকাম হওয়াই তোমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য হয়। বিপরীত পক্ষে এর থেকে ভিন্নতর প্রত্যেকটি কর্মনীতি তোমাদের জন্য ভুল ও বিভ্রান্তিকর। প্রথম কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে (যেটি গ্রহণ করার স্বাধীন ক্ষমতা তোমাদের দেয়া হয়েছে) তোমরা দুনিয়ায় শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করবে। তারপর আমার কাছে ফিরে আসলে আমি তোমাদের দান করবো চিরন্তন আরাম ও আনন্দের আবাস জান্নাত। আর দ্বিতীয় কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে (যেটি গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তোমাদের দেয়া হয়েছে) তোমাদের দুনিয়ায় বিপর্যয় ও অস্থিরতার মুখোমুখি হতে হবে এবং দুনিয়ার জীবন শেষ করে আখেরাতে প্রবেশ কালে সেখানে জাহান্নাম নামক চিরন্তন মর্মজ্বালা, দুঃখ, কষ্ট ও বিপদের গভীর গর্তে তোমরা নিক্ষিপ্ত হবে।

৩. এ কথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পর বিশ্ব জাহানের মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানব জাতিকে পৃথিবীতে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মানব জাতির দুই সদস্য (আদম ও হাওয়া) বিশিষ্ট প্রথম গ্রুপকে তিনি পৃথিবীতে জীবন যাপন করার জন্য বিধান দান করেন। এই বিধান অনুযায়ী তাদের ও তাদের সন্তান সন্ততিদের দুনিয়ার সমস্ত কাজ কারবার চালিয়ে যেতে হবে। মানুষের এই প্রাথমিক বংশধররা মূর্খতা, অজ্ঞতা ও অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্ট হননি। আল্লাহ পৃথিবীতে তাদের জীবনের সূচনা করেন সম্পূর্ণ আলোর মধ্যে। তারা সত্যকে জানতেন। তাদেরকে জীবন বিধান দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর আনুগত্য (অর্থাৎ ইসলাম) ছিল তাদের জীবন পদ্ধতি। তাঁরা তাঁদের সন্তানদেরও আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্

(মুসলিম) হিসেবে জীবন যাপন করার কথা শিখিয়ে গেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শত শত বছরের জীবনাচরনে মানুষ ধীরে ধীরে এই সঠিক জীবন পদ্ধতি (অর্থাৎ দ্বীন) থেকে দূরে সরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভুল কর্মনীতি অবলম্বন করেছে। গাফলতির ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে তারা এক সময় এই সঠিক জীবন পদ্ধতি হারিয়ে ফেলেছে। আবার শয়তানী প্ররোচনায় একে বিকৃতও করেছে। তারা পৃথিবী ও আকাশের মানবিক ও অমানবিক এবং কাল্পনিক ও বস্তুগত বিভিন্ন সত্তাকে আল্লাহর সাথে তাঁর কাজ কারবারে শরীক করেছে। আল্লাহ প্রদত্ত যথার্থ জ্ঞানের (আল ইল্‌ম) মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কল্পনা, ভাববাদ, মনগড়া মতবাদ ও দর্শনের মিশ্রণ ঘটিয়ে তারা অসংখ্য ধর্মের সৃষ্টি করেছে। তারা আল্লাহ নির্ধারিত ন্যায়নিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতি (শরীয়ত) পরিহার বা বিকৃত করে নিজেদের প্রবৃত্তি, স্বার্থ ও ঝোঁক প্রবণতা অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য নিজেরাই এমন বিধান তৈরী করেছে যার ফলে আল্লাহর এই যমীন জুলুম নিপীড়নে ভরে গেছে।

৪. আল্লাহ যদি তাঁর স্রষ্টাসুলভ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিপথগামী মানুষদেরকে জোরপূর্বক সঠিক কর্মনীতি ও জীবনধারার দিকে ঘুরিয়ে দিতেন তাহলে তা হতো মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত সীমিত স্বাধীনতা দান নীতির পরিপন্থী। আবার এ ধরনের বিদ্রোহ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই তিনি যদি মানুষকে ধ্বংস করে দিতেন তাহলে সেটি হতো সমগ্র মানব জাতিকে পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তিনি যে সময় ও সুযোগ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার সাথে অসামঞ্জস্যশীল। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে তিনি তাকে পথ নির্দেশনা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। কাজেই নিজের ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি মানব জাতির মধ্য থেকে এমন একদল লোককে ব্যবহার করতে শুরু করেন যাঁরা তাঁর ওপর ঈমান রাখতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যেতেন। এঁদেরকে তিনি করেন নিজের প্রতিনিধি। এঁদের কাছে পাঠান নিজের অলংঘনীয় বাণী। যথার্থ সত্য জ্ঞান ও জীবন যাপনের সঠিক বিধান এঁদেরকে দান করে তিনি বনী আদমকে ভুল পথ থেকে এই সহজ সত্য পথের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দেয়ার জন্য এদেরকে নিযুক্ত করেন।

৫. এঁরা ছিলেন আল্লাহর নবী। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে আল্লাহ তাঁর নবী পাঠাতে থাকেন। হাজার হাজার বছর থেকে তাদের

আগমনের এ সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তাঁদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। তাঁরা সবাই একই দ্বীনের তথা জীবন পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষকে যে সঠিক কর্মনীতির সাথে পরিচিত করানো হয়েছিল তাঁরা সবাই ছিলেন তারই অনুসারী। তাঁরা সবাই ছিলেন একই হেদায়েতের প্রতি অনুগত। অর্থাৎ প্রথম দিন থেকেই মানুষের জন্য নৈতিকতা ও সমাজ-সংস্কৃতির যে চিরন্তন নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল তাঁরা ছিলেন তারই প্রতি অনুগত। তাঁদের সবার একই মিশন ছিল। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের বংশধর, গোত্র ও জাতিকে এই দ্বীন ও হেদায়াতের দিকে আহ্বান জানান। তারপর যারা এ আহ্বান গ্রহণ করে তাদেরকে সংগঠিত করে এমন একটি উম্মতে পরিণত করেন যাঁরা নিজেরা হন আল্লাহর আইনের অনুগত এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইনের আনুগত্য কায়েম করার এবং তাঁর আইনের বিরুদ্ধাচরণ প্রবণতা প্রতিরোধ করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকেন। এই নবীগণ প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের যুগে অত্যন্ত সুচারুরূপে এ মিশনের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু সব সময় দেখা গেছে মানব গোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুতই হয়নি। আর যারা এই দাওয়াত গ্রহণ করে উম্মতে মুসলিমার অংগীভূত হয় তারাও ধীরে ধীরে নিজেরাই বিকৃতির সাগরে তলিয়ে যেতে থাকে। এমনকি তাদের কোনো কোনো উম্মত আল্লাহ্ প্রদত্ত হেদায়াত একেবারেই হারিয়ে ফেলে। আবার কেউ কেউ আল্লাহর বাণীর সাথে নিজেদের কথার মিশ্রণ ঘটিয়ে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে তার চেহারাই বিকৃত করে দেয়।

৬. সবশেষে বিশ্ব জাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরব দেশে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠান। ইতিপূর্বে বিভিন্ন নবীকে তিনি যে দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরও সেই একই দায়িত্ব অর্পন করেন। সাধারণ মানুষের সাথে সাথে পূর্বের নবীদের পথভ্রষ্ট উম্মতদেরকেও তিনি আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানান। সবাইকে সঠিক কর্মনীতি ও সঠিক পথ গ্রহণের দাওয়াত দেন। সবার কাছে নতুন করে আল্লাহর হেদায়াত পৌঁছিয়ে দেয়া এবং এই দাওয়াত ও হেদাযাত গ্রহণকারীদেরকে এমন একটি উম্মতে পরিণত করাই ছিল তাঁর কাজ যারা একদিকে আল্লাহর হেদায়াতের ওপর

নিজেদের জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অন্যদিকে সমগ্র দুনিয়ার সংশোধন ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবে। এই দাওয়াত ও হেদায়াতের কিতাব হচ্ছে এই কুরআন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আল্লাহ এই কিতাবটি অবতীর্ণ করেন।

কুরআনের মূল আলোচ্য

কুরআন সম্পর্কিত এই মৌলিক ও প্রাথমিক কথাগুলো জেনে নেয়ার পর পাঠকের জন্য এই কিতাবের বিষয়বস্তু এর কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় ও লক্ষবিন্দু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সহজ হয়ে যায়।

এর বিষয়বস্তু মানুষ। প্রকৃত ও জাজ্জ্বল্যমান সত্যের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণ কিসে- এ কথাই কুরআনের মূল বিষয়বস্তু। এর কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, আপাত দৃষ্টি, আন্দাজ অনুমান নির্ভরতা অথবা প্রবৃত্তির দাসত্ব করার কারণে মানুষ আল্লাহ, বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাপনা, নিজের অস্তিত্ব ও নিজের পার্থিব জীবন সম্পর্কে যেসব মতবাদ গড়ে তুলেছে এবং ঐ মতবাদগুলোর ভিত্তিতে যে দৃষ্টিভংগি ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছে যথার্থ জাজ্জ্বল্যমান সত্যের দৃষ্টিতে তা সবই ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ এবং পরিণতির দিক দিয়ে তা মানুষের জন্য ধ্বংসকর। আসল সত্য তাই যা মানুষকে খলীফা হিসেবে নিযুক্ত করার সময় আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছিলেন। আর এই আসল সত্যের দৃষ্টিতে মানুষের জন্য ইতিপূর্বে সঠিক কর্মনীতি নামে যে দৃষ্টিভংগি ও কর্মনীতির আলোচনা করা হয়েছে তাই সঠিক, নির্ভুল ও শুভ পরিণতির দাবীদার।

এর চূড়ান্ত লক্ষ ও বক্তব্য হচ্ছে, মানুষকে সঠিক দৃষ্টিভংগি ও কর্মনীতি অবলম্বনের প্রতি আহ্বান জানানো এবং আল্লাহর হেদায়াতকে দ্ব্যর্থহীনভাবে পেশ করা। মানুষ নিজের গাফলতি ও অসতর্কতার দরুন এগুলো হারিয়ে ফেলেছে এবং তার শয়তানী প্রবৃত্তির কারণে সে এগুলোকে বিভিন্ন সময় বিকৃত করার কাজই করে এসেছে।

এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে কুরআন পাঠ করতে থাকলে দেখা যাবে এই কিতাবটি তার সমগ্র পরিসরে কোথাও তার বিষয়বস্তু, কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় এবং মূল লক্ষ ও বক্তব্য থেকে এক চুল পরিমাণও সরে পড়েনি। প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তার বিভিন্ন ধরনের বিষয়াবলী তার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত আছে যেমন একটি

মোতির মালার বিভিন্ন রংয়ের ছোট বড় মোতি একটি সূতোর বাঁধনে এক সাথে, একত্রে একটি নিবিড় সম্পর্কে গাঁথা থাকে। কুরআনে আলোচনা করা হয় পৃথিবী ও আকাশের গঠনাকৃতির, মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া পদ্ধতি এবং বিশ্ব জগতের নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণের ও অতীতের বিভিন্ন জাতির ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর। কুরআনে বিভিন্ন জাতির আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কর্মকান্ডের সমালোচনা করা হয়। অতি প্রাকৃতিক বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা করা হয়। এই সাথে অন্যান্য আরো বহু জিনিসের উল্লেখও করা হয়। শিক্ষা দেয়ার জন্য কুরআনে এগুলো আলোচনা করা হয়নি। বরং প্রকৃত ও জাজ্জ্বল্যমান সত্য সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারনা দূর করা, যথার্থ সত্যটি মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া, যথার্থ সত্য বিরোধী কর্মনীতির ভ্রান্তি ও অশুভ পরিণতি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং সত্যের অনুরূপ ও শুভ পরিণতির অধিকারী কর্মনীতির দিকে মানুষকে আহ্বান করাই এর উদ্দেশ্য। এ কারণেই এতে প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা কেবলমাত্র ততটুকুই এবং সেই ভংগিমায় করা হয়েছে যতটুকু এবং যে ভংগিমায় আলোচনা করা তার মূল লক্ষের জন্য প্রয়োজন। প্রয়োজন মতো এসব বিষয়ের আলোচনা করার পর কুরআন সব সময় প্রয়োজনীয় বিস্তারিত আলোচনা বাদ দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের দিকে ফিরে এসেছে। একটি সুগভীর ঐক্য ও একাত্মতা সহকারে তার সমস্ত আলোচনা 'ইসলামী দাওয়াত'-এর কেন্দ্রবিন্দুতে ঘুরছে।

কুরআন নাযিলের পদ্ধতি

কিন্তু কুরআনের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি, বিন্যাস রীতি ও তার বহুতর আলোচ্য বিষয়কে পুরোপুরি হৃদয়ংগম করতে হলে তার অবতরণের রীতি-পদ্ধতি ও অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানলাভ করতে হবে।

মহান আল্লাহ এই কুরআনটি একবারে লিখে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে দিয়ে এর বহুল প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে একটি বিশেষ জীবন ধারার দিকে আহ্বান জানাবার নির্দেশ দেননি। এটি আদৌ তেমন ধরনের কোনো কিতাব নয়। অনুরূপভাবে এই কিতাবে প্রচলিত রচনা পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা করা হয়নি। এজন্য রচনা বিন্যাসের প্রচলিত পদ্ধতি এবং সাধারণভাবে যে পদ্ধতিতে বই লেখা হয় তা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আসলে এটি একটি অভিনব ধরনের কিতাব। মহান আল্লাহ আরব দেশের মক্কা নগরীতে তাঁর

এক বান্দাকে নবী করে পাঠালেন। নিজের শহর ও গোত্র (কোরাইশ) থেকে দাওয়াতের সূচনা করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দিলেন। এ কাজ শুরু করার জন্য প্রথম দিকে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় বিধানগুলিই তাঁকে দেয়া হলো। এ বিধানগুলি ছিল প্রধানত তিনটি বিষয়বস্তু সম্বলিত।

এক. নবীকে শিক্ষা দান। এই বিরাট ও মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য তিনি নিজেকে কিভাবে তৈরী করবেন এবং কোন পদ্ধতিতে কাজ করবেন তা তাঁকে শিখিয়ে দেয়া হলো।

দুই, যথার্থ সত্য সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যাবলী সরবরাহ এবং সত্য সম্পর্কে চারপাশের লোকদের মধ্যে যে ভুল ধারণাগুলো পাওয়া যেতো সংক্ষেপে সেগুলো খন্ডন। এগুলির কারণে তারা ভুল কর্মনীতি গ্রহণ করতো।

তিন, সঠিক কর্মনীতির দিকে আহ্বান। আল্লাহর বিধানের যেসব মৌলিক চরিত্র নীতির অনুসরণ মানুষের জন্য কল্যাণ ও সৌভাগ্যের বার্তাবহ সেগুলো বিবৃত করা হলো

ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্ব

প্রথম দিকের এ বাণীগুলো দাওয়াতের সূচনা কালের পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় ছোট ছোট সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাক তা। এগুলোর ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, মিষ্টি-মধুর, ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী এবং যে জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে তাদের রুচি অনুযায়ী সর্বোত্তম সাহিত্য রস সমৃদ্ধ। ফলে এ কথাগুলো মনে গেঁথে যেতো তীরের মতো। ভাষার ঝংকার ও সুর লালিত্যের কারণে এগুলোর দিকে কান নিজে নিজেই অতি দ্রুত আকৃষ্ট হতো। সময়োপযোগী এবং মনের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যশীল হবার কারণে জিহ্বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগুলোর পুনরাবৃত্তি করতো। আবার এতে স্থানীয় প্রভাব ছিল অনেক বেশী। বিশ্বজনীন সত্য বর্ণনা করা হলেও সেজন্য যুক্তি, প্রমাণ ও উদাহরণ গ্রহণ করা হতো এমন নিকটতম পরিবেশ থেকে যার সাথে শ্রোতারা ভালোভাবে পরিচিত ছিল। তাদেরই আকীদাগত, নৈতিক ও সামাজিক ত্রুটিগুলোর ওপর ছিল সমস্ত আলোচনার ভিত্। এভাবে এর প্রভাব গ্রহণ করার জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরী করা হয়েছিল।

ইসলামী দাওয়াতের এ সূচনা পর্বটি প্রায় চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত জারী ছিল। এ পর্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলাম প্রচারের তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়।

১. কতিপয় সৎকর্মশীল ব্যক্তি ইসলামী দাওয়াত গ্রহণ করেন। তাঁরা 'মুসলিম উম্মাহ' নামে একটি উম্মত গড়ে তুলতে প্রস্তুত হন।
২. বিপুল সংখ্যক লোক মূর্খতা, স্বার্থান্ধতা বা বাপ-দাদার রসম রেওয়াজের প্রতি অন্ধ আসক্তির কারণে এই দাওয়াতের বিরোধিতা করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।
৩. মক্কা ও কুরাইশদের সীমানা পেরিয়ে এই নতুন দাওয়াতের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে অপেক্ষাকৃত বিশাল বিস্তৃত এলাকায়।

ইসলামী দাওয়াতের দ্বিতীয় অধ্যায়

এখান থেকে এই দাওয়াতের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়ে যায়। এ পর্যায়ে ইসলামের এই আন্দোলন ও পুরাতন জাহেলিয়াতের মধ্যে একটি কঠিন প্রাণান্তকর সংঘাত সৃষ্টি হয়। আট নয় বছর পর্যন্ত এ সংঘাত চলতে থাকে। কেবল মক্কার ও কুরাইশ গোত্রের লোকেরাই নয় বরং বিস্তীর্ণ আরব ভূখন্ডের অধিকাংশ এলাকার যেসব লোক পুরাতন জাহেলিয়াতকে অপরিবর্তিত রাখতে অধিকাংশ এলাকার যেসব লোক পুরাতন জাহেলিয়াতকে অপরিবর্তিত রাখতে চাইছিল তারা সবাই বল প্রয়োগ করে এই আন্দোলনটির কণ্ঠরোধ করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। একে দাবিয়ে দেয়ার জন্য তারা সব রকমের অস্ত্র ব্যবহার করে। মিথ্যা প্রচারণা চালায়। অভিযোগ, সন্দেহ, সংশয় ও আপত্তি উত্থাপন করে অসংখ্য। সাধারণ মানুষের মনে নানান প্রচারণার বীজ বপন করে। অপরিচিত লোকেরা যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনতে না পারে সে জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর চালায় বর্বর পাশবিক নির্যাতন। তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট করে। তাদের ওপর এত বেশী উৎপীড়ন নির্যাতন চালায় যার ফলে তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে অনেক লোক দু'দুবার নিজেদের দেশ ত্যাগ করে আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করে যেতে বাধ্য হয়, অবশেষে তাদের সবাইকে মদীনার দিকে হিজরত করতে হয়। কিন্তু এই কঠিন ও ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এ আন্দোলনটি বিস্তার লাভ করতে থাকে। মক্কায় এমন কোনো বংশ ও পরিবার ছিল না যার কোনো না কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেনি। অধিকাংশ ইসলাম বিরোধীর ভাই-ভাইপো, পুত্র-কন্যা, ভগ্নী-ভগ্নীপতি ইসলামী দাওয়াতের কেবল অনুসারীই

ছিল না বরং প্রাণ উৎসর্গকারী কর্মীর ভূমিকা পালন করছিল এবং তাদের কলিজার টুকরা সন্তানরাই তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত হবার প্রস্তুতি নিয়েছিল- এটিই ছিল তাদের শত্রুতার তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা ও তিক্ততার কারণ। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যারা পুরাতন জাহেলিয়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এই নবজাত আন্দোলনে যোগদান করছিল, তারা ইতিপূর্বেও তাদের সমাজের সর্বোত্তম লোক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। অতঃপর এই আন্দোলনে যোগদান করে তারা এতই সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও পূত চরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠছিল যে, দুনিয়াবাসীর চোখে এই আন্দোলনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য অনুভূত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। যে দাওয়াত এ ধরনের লোকদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে তাদেরকে এহেন উন্নত পর্যায়ের মানবিক গুণসম্পন্ন করে তুলছিল তার শ্রেষ্ঠত্ব দুনিয়াবাসীর চোখে সমুজ্জল হয়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক।

এই সুদীর্ঘ ও তীব্র সংঘাতকালীন সময়ে মহান আল্লাহ পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের নবীর ওপর এমনসব আবেগময় ভাষণ অবতীর্ণ করতে থাকেন যার মধ্যে ছিল স্রোতস্বিনীর গতিময়তা, বন্যার প্রচন্ড শক্তি এবং আগুনের তীক্ষ্ণতা ও তেজময়তার প্রভাব। এই ভাষণগুলোর মাধ্যমে একদিকে ঈমানদারদেরকে জানানো হয়েছে তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদের মধ্যে দলীয় চেতনা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে তাকওয়া, উন্নত চারিত্রিক মাহাত্ম ও পবিত্র-নিষ্কলুষ স্বভাব-প্রকৃতি ও আচরণবিধি শেখানো হয়েছে। আল্লাহর সত্য দ্বীন প্রচারের পদ্ধতি তাদেরকে জানানো হয়েছে। সাফল্যদানের অংগীকার ও জান্নাত লাভের সুসংবাদ দান করে তাদের হিম্মত ও মনোবল সুদৃঢ় করা হয়েছে। আল্লাহর পথে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, অবিচলতা ও উন্নত মনোবল সহকারে সংগ্রাম সাধনা চালিয়ে যাবার জন্য তাদেরকে উদ্দীপিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রাণ উৎসর্গীতার এমন বিপুল আবেগ ও উদ্দীপনা যার ফলে তারা সব রকমের বিপদের মোকাবিলা করতে এবং বিরোধিতার উত্তুংগ তুফানের সামনে অটল-অচল পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে যেতে প্রস্তুত হয়েছিল। অন্যদিকে বিরোধিতাকারী, সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত এবং গাফলতির ঘুমে অচেতন জনসমাজকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এমন সব জাতির মর্মান্তিক ও ধ্বংসকর পরিণতির চিত্র তুলে ধরে যাদের

ইতিহাসের সাথে তারা পরিচিত ছিল। যেসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের ওপর দিয়ে সফর ব্যাপদেশে দিনরাত তাদের যাওয়া-আসা করতে হতো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো দেখিয়ে তাদেরকে শিক্ষা উপদেশ দেয়া হয়েছে। পৃথিবী ও আকাশের উন্মুক্ত পরিসরে দিনরাত যেসব শত শত হাজার হাজার সুস্পষ্ট নিদর্শন তাদের চোখের সামনে বিরাজ করছিল এবং নিজেদের জীবনে যেগুলোর প্রভাব তারা হরহামেশা অনুভব করছিল, সেগুলো থেকে তাদেরকে তওহীদ ও আখেরাতের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। শিরক ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং পরকাল অস্বীকার ও বাপ-দাদাদের ভ্রান্ত পথের অন্ধ অনুসৃতির ভুলগুলো তুলে ধরা হয়েছে এমন সব দ্ব্যর্থহীন যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে যেগুলো সহজে মন-মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করতে পারে। তারপর তাদের প্রত্যেকটি সন্দেহ-সংশয় নিরসন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ জবাব দেয়া হয়েছে। যেসব জটিল মানসিক সমস্যায় তারা নিজেরা ভুগছিল এবং অন্যদের মনেও যেসব সমস্যার আবর্ত সৃষ্টি করতে চাইছিল সেগুলোর কুয়াশা থেকে তাদের মনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করেছে। এভাবে সবদিক দিয়ে ঘেরাও করে এমন সুকঠিনভাবে জাহেলিয়াতকে পাকড়াও করা হয়েছে যার ফলে বুদ্ধি, চিন্তা ও মননের জগতে তার শ্বাস ফেলার জন্য এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গাও থাকেনি। এই সাথে তাদের ভয় দেখানো হয়েছে আল্লাহর ক্রোধের, কিয়ামতের বিচারের ভয়াবহতার ও জাহান্নামের শাস্তির। অসৎ চরিত্র, ভুল জীবনধারা, জাহেলী রীতিনীতি, সত্যের দুশমনি ও মুসলিম নিপীড়নের জন্য তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার যেসব বড় বড় মূলনীতির ভিত্তিতে দুনিয়ায় হামেশা আল্লাহর প্রিয় ও মনোনীত সৎ ও উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্ রচিত হয়ে এসেছে সেগুলো তাদের সামনে পেশ করা হয়েছে।

এ পর্যায়টি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। প্রতিটি স্তরে দাওয়াত অধিকতর ব্যাপক হতে চলেছে। একদিকে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম এবং অন্যদিকে বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা কঠিন থেকে কঠিনতর হতে চলেছে। বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস ও বিভিন্ন কর্মধারার অধিকারী গোত্র ও দলগুলোর মুখোমুখি হতে হয়েছে। সেই অনুযায়ী আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বাণীসমূহের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র বাড়তে থেকেছে।

এই হচ্ছে কুরআন মজীদে অংকিত মক্কী জীবনের পটভূমি।

দাওয়াতের তৃতীয় অধ্যায়

মক্কায় এই আন্দোলন তের বছর সক্রিয় থাকার পর হঠাৎ মদীনায় সন্ধান পেলো একটি কেন্দ্রের। সমগ্র আরব ভূখন্ড থেকে এক এক করে নিজের সমস্ত অনুসারীকে সেখানে একত্র করে নিজের সমুদয় শক্তিকে একটি কেন্দ্রে একীভূত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলামের অধিকাংশ অনুসারী হিজরাত করে মদীনা পৌছে গেলেন। এভাবে ইসলামী দাওয়াত তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করলো।

এই পর্যায়ে অবস্থার চিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেলো। মুসলিম উম্মাহ একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সফল হলো। পুরাতন জাহেলিয়াতের ধারকদের সাথে শুরু হলো সশস্ত্র সংঘাত। আগের নবীদের উম্মতদের (ইহুদী ও নাসারা) সাথেও সংঘাত বাঁধলো। উম্মতে মুসলিমার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করলো বিভিন্ন ধরনের মুনাফিক। তাদের সাথেও লড়তে হলো। দশ বছরের কঠিন সংঘর্ষ-সংঘাতের পথ পেরিয়ে এই আন্দোলন সাফল্যের মনযিলে পৌছে গেলো। সমগ্র আরব ভূখন্ডে বিস্তৃত হলো তার আধিপত্য। তার সামনে খুলে গেলো বিশ্বজনীন দাওয়াত ও সংস্কারের দুয়ার। এই পর্যায়টিও কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। প্রত্যেক স্তরে ছিল এই আন্দোলনের বিশিষ্ট প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য বিষয়গুলো। এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এমন সব ভাষণ ও বক্তব্য অবতীর্ণ হতে থাকলো, যেগুলো কখনো হতো অনলবর্ষী বক্তৃতার মতো, কখনো হাযির হতো সেগুলো রাজকীয় ফরমান ও নির্দেশের চেহারা নিয়ে, আবার কখনো শিক্ষকের শিক্ষাদান ও অধ্যাপনা এবং সংস্কারকের উপদেশ দান ও বুঝাবার প্রচেষ্টা তার মধ্যে ফুটে উঠতো। দল ও রাষ্ট্র এবং সৎ ও সুন্দর নাগরিক জীবন কিভাবে গড়ে তুলতে হবে, জীবনের বিভিন্ন বিভাগগুলো কোন্ নীতি ও শৃংখলা-বিধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, মুনাফিকদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করতে হবে, যিম্মী কাফের, আহ্লি কিতাব, যুদ্ধরত শত্রু এবং চুক্তি সূত্রে আবদ্ধ জাতিদের ব্যাপারে কোন্ ধরণের কর্মনীতি অবলম্বন করা হবে এবং সুসংগঠিত ঈমানদারদের এই দলটি দুনিয়ায় আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করার জন্য নিজেকে কিভাবে তৈরী করবে- এসব কথা সেখানে বিবৃত হতো। এই বক্তৃতাগুলোর মাধ্যমে

মুসলমানদের শিক্ষা ও তরবিয়াত (ট্রেনিং) দান করা হতো, তাদের দুর্বলতাগুলো দূর করা হতো, আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হতো, জয়-পরাজয়, আরাম-মুসিবত, দুঃখ-আনন্দ, দারিদ্র-স্বচ্ছলতা, নিরাপত্তা-ভীতি ইত্যাদি সব ধরনের অবস্থায় সেই অবস্থার উপযোগী নৈতিকতার শিক্ষা দেয়া হতো। তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ইসলামী দাওয়াত ও সংস্কারের কাজ সম্পাদন করার যোগ্যতা সম্পন্ন করে তৈরী করা হতো। অন্যদিকে আহলে কিতাব, মুনাফিক, মুশরিক ও কাফের ইত্যাদি যারা ঈমানের পরিসরের বাইরে অবস্থান করছিল, তাদের সবাইকে তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে বুঝাবার, হৃদয়গ্রাহী-ভাষায় দাওয়াত দেয়ার, কঠোরভাবে তিরস্কার ও উপদেশ দান করার, আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাবার এবং শিক্ষণীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী থেকে উপদেশ ও শিক্ষাদান করার চেষ্টা করা হতো। এভাবে সত্যকে উপস্থাপন করার ব্যাপারে তাদের সামনে কোনো জড়তা বা অস্পষ্টতা থাকেনি।

এই হচ্ছে কুরআন মজীদের মাদানী সূরাগুলির প্রেক্ষাপট।

কুরআনের বর্ণনা ভংগী

এ বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একটি দাওয়াতের বাণী নিয়ে কুরআন মজীদ নাযিল হওয়া শুরু হয়। দাওয়াতটি শুরু হবার পর থেকে নিয়ে তার পূর্ণতার চূড়ান্ত মনযিলে পৌঁছা পর্যন্ত পূর্ণ তেইশ বছরে তাকে যে সব পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করতে হয় তাদের বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কুরআনের বিভিন্ন অংশ নাযিল হতে থাকে। কাজেই ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করার জন্য যে সব বই পত্র লেখা হয় সেগুলোর মতো রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু বিন্যস্ত করার কায়দা এখানে অবলম্বিত হয়নি। আবার এই দাওয়াতের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে কুরআনের ছোট বড় যে সমস্ত অংশ নাযিল হয় সেগুলোও কোনো পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হতো না বরং বক্তৃতা ও বিবৃতির আকারে বর্ণনা করা হতো এবং সেভাবে প্রচারও করা হতো। তাই সেগুলোর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে লেখার নয়, বক্তৃতার ভংগিমা। তারপর এই বক্তৃতাও কোনো অধ্যাপকের নয় বরং একজন আহ্বায়কের বক্তৃতার মতো ছিল। মন, মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ও আবেগ সবার কাছেই সে আবেদন জানাতো। তাকে সব রকমের মানসিকতার মুখোমুখি

হতে হতো। নিজের দাওয়াত ও প্রচার এবং কার্যকর আন্দোলনের ব্যাপারে তাকে অসংখ্য বৈচিত্রপূর্ণ অবস্থায় কাজ করতে হতো। সম্ভাব্য সকল উপায়ে নিজের কথা মনের মধ্যে বসিয়ে দেয়া, চিন্তার জগত বদলে দেয়া, আবেগের সমুদ্রে তরংগ সৃষ্টি করা, বিরোধিতার পাহাড় ভেঙে ফেলা, সহযোগীদের সংশোধন করা ও প্রশিক্ষণ দান এবং তাদের মধ্যে প্রেরণা, উদ্দীপনা ও দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি করা, শত্রুদের বন্ধু ও অস্বীকারকারীদের স্বীকারকারীতে পরিণত করা, বিরোধীদের যুক্তি প্রমাণ খন্ডন করা এবং তাদের নৈতিক শক্তি ছিন্নভিন্ন করা-এভাবে তাকে এমন সব কাজ করতে হতো, যা একটি দাওয়াতের ধারক বাহক এবং একটি আন্দোলনের নেতার জন্য অপরিহার্য। এজন্য মহান আল্লাহ এই কাজ ও দায়িত্ব প্রসংগে তাঁর নবীর ওপর যে সমস্ত ভাষণ নাযিল করেছেন তার ধরণ ও প্রকৃতি একটি দাওয়াতের উপযোগীই হয়েছে। সেখানে কলেজের অধ্যাপক সুলভ বক্তৃতাভংগি অনুসন্ধান করা উচিত নয়।

এখান থেকে আর একটি বিষয়ও সহজে বুঝতে পারা যায়। সেটি হচ্ছে, কুরআনে একই বিষয়ের আলোচনা বিভিন্ন স্থানে বারবার কেন এসেছে? একটি দাওয়াত ও একটি বাস্তব-সক্রিয় আন্দোলনের কতগুলি স্বাভাবিক চাহিদা ও দাবী রয়েছে। এই আন্দোলন যে সময় যে পর্যায়ে অবস্থান করে সে সময় সেই পর্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল কথাই বলতে হবে। যতক্ষণ দাওয়াত এক পর্যায়ে অবস্থান করে ততক্ষণ পরবর্তী পর্যায়গুলির প্রসংগ সেখানে উত্থাপিত হতে পারবে না। বরং সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের কথাই বারবার আলোচিত হতে হবে। এতে কয়েক মাস বা কয়েক বছর অতিক্রান্ত হলেও তার পরোয়া করা যাবে না। আবার একই বাক্যের মধ্যে একই ধরনের কথার একই ভংগিমায় পুনরাবৃত্তি চলতে থাকলে তা শুনতে শুনতে কান পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং মনে বিরক্তির সঞ্চার হয়। তাই প্রতি পর্যায়ে যে কথাগুলো বারবার বলার প্রয়োজন দেখা দেবে সেগুলোকে প্রতি বার নতুন শব্দের মোড়কে, নতুন ভংগিমায় এবং রঙে সাজিয়ে নতুন কায়দায় মার্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে, যাতে সেগুলো সুখকর ভাবাবেশে মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং দাওয়াতের এক একটি মনযিল সুদৃঢ় হতে থাকে। এই সাথে দাওয়াতের ভিত্তি যেসব বিশ্বাস ও মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলোকে প্রথম পদক্ষেপ থেকে নিয়ে শেষ পর্যায়ে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি হতে হবে। একারণে দেখা যায়, ইসলামী দাওয়াতের

এক পর্যায়ে কুরআন মজীদের যতগুলো সূরা নাযিল হয়েছে তার সবগুলোর মধ্যে সাধারণত একই ধরনের বিষয়বস্তু, শব্দ ও বর্ণনা ভংগির খোলস পরিবর্তন করে এসেছে। তবে তওহীদ, আল্লাহর গুণাবলী, আখেরাত, আখেরাতের জবাবদিহি, কিয়ামতে পুরস্কার ও শাস্তি, রিসালাত, কিতাবের ওপর ঈমান, তাকওয়া, সবর, তাওয়াক্কুল এবং এ ধরনের অন্যান্য মৌলিক বিষয়ের আলোচনা সারা কুরআনে সর্বত্র বার বার দেখা যায়। কারণ এই আন্দোলনের কোন পর্যায়ে এই মৌলিক চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাগুলো সামান্য দুর্বল হয়ে পড়লে ইসলামের এই আন্দোলন কখনো তার যথার্থ প্রাণশক্তি সহকারে গতিশীল হতে পারতো না।

এহেন বিন্যাসের কারণ

যে ক্রমিক ধারায় কুরআন নাযিল হয়েছিল একে গ্রন্থ আকারে বিন্যস্ত ও লিপিবদ্ধ করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ধারা অক্ষুণ্ন রাখেননি কেন এ প্রশ্নের জবাব একটু চিন্তা করলে আমাদের এই বর্ণনায়ই পাওয়া যাবে।

উপরের আলোচনায় আপনারা জেনেছেন, তেইশ বছর ধরে কুরআন নাযিল হয়েছে। যে ক্রমানুসারে ইসলামী দাওয়াতের সূচনা ও অগ্রগতি হয়েছে সেই ক্রমানুসারেই কুরআন নাযিল হতে থেকেছে। এখন সহজেই অনুমান করা যায়, দাওয়াত পূর্ণতা লাভ করার পর কুরআনের নাযিলকৃত অংশগুলির এমন ধরনের বিন্যাস যা কেবল দাওয়াতের ক্রমোন্নতির সাথে সম্পর্কিত ছিল- কোনো ক্রমেই সঠিক হতে পারে না। এখন তাদের জন্য দাওয়াত পূর্ণতা লাভের পর সৃষ্ট অবস্থার অধিকতর উপযোগী একটি নতুন ধরনের বিন্যাসের প্রয়োজন ছিল। কারণ শুরুতে সে এমন সব লোককে সর্বপ্রথম দাওয়াত দেয় যারা ছিল ইসলামের সাথে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। তাই তখন একেবারে গোড়া থেকেই শিক্ষা ও উপদেশ দানের কাজ শুরু হয়। কিন্তু দাওয়াত পরিপূর্ণতা লাভ করার পর তার প্রথম লক্ষ হয় এমন সব লোক যারা তার ওপর ঈমান এনে একটি উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং যাদের ওপর এই কাজ জারী রাখার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দাওয়াতকে চিন্তা ও কর্মধারা উভয় দিক দিয়ে পূর্ণতা দান করার পর তাদের হাতে সোপর্দ করেছিলেন। এখন নিশ্চিতরূপে সর্বপ্রথম তাদের নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নিজেদের জীবন

যাপনের জন্য আইন কানুন এবং পরবর্তী নবীদের উম্মতদের মধ্যে যে সমস্ত ফিত্না সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তারপর ইসলামের সাথে অপরিচিত দুনিয়াবাসীদের কাছে আল্লাহর বিধান পেশ করার জন্য তাদের এগিয়ে যেতে হবে।

তাছাড়া কুরআন মজীদ যে ধরনের কিতাব কোনো ব্যক্তি গভীর মনোযোগ সহকারে তা পাঠ করার পর এ কথা তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, একই ধরনের বিষয়বস্তুকে এক জায়গায় একত্র করার বিষয়টি কুরআনের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কুরআনের প্রকৃতিই দাবী করে, তা পাঠকের সামনে মাদানী পর্যায়ের কথা মক্কী যুগের শিক্ষার মধ্যে, মক্কী পর্যায়ের কথা মাদানী যুগের বক্তৃতাবলীর মধ্যে এবং প্রাথমিক যুগের আলোচনা শেষ যুগের উপদেশাবলীর মধ্যে এবং শেষ যুগের বিধানসমূহ সূচনাকালের শিক্ষাবলীর পাশাপাশি বার বার আলোচিত হবে। এভাবে ইসলামের পূর্ণ, ব্যাপকতর ও সামগ্রিক চিত্র তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ইসলামের একটি দিক তার চোখের সামনে থাকবে এবং অন্য দিকটি থাকবে তার চোখের আড়ালে, কখনো এমনটি যেন না হয়।

তারপরও কুরআন যে ক্রমানুসারে নাযিল হয়েছিল যদি সেভাবেই তাকে বিন্যস্ত করা হতো তাহলে পরবর্তীকালে আগত লোকদের জন্য তা কেবল সেই অবস্থায় অর্থপূর্ণ হতে পারতো যখন কুরআনের সাথে সাথে তার নাযিলের ইতিহাস এবং তার এক একটি অংশের নাযিল হওয়ার অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিত লিখে দেয়া হতো। এ অবস্থায় তা পরিশিষ্ঠ আকারে কুরআনের একটি অপরিহার্য অংশে পরিণত হতো। মহান আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে তাঁর বাণী একত্র করে বিন্যস্ত ও সংরক্ষণ করেছিলেন এটি ছিল তার পরিপন্থী। আল্লাহর কালামকে নির্ভেজাল অবস্থায় অন্য কোন কালাম বাণী বা কথার মিশ্রণ বা অন্তর্ভূক্তি ছাড়াই সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত করাই ছিল আল্লাহর উদ্দেশ্য। এ কালাম পাঠ করবে যুবক, বৃদ্ধ, শিশু, নারী, পুরুষ, নগরবাসী, গ্রামবাসী শিক্ষিত, সুধী, পন্ডিত, সাধারণ শিক্ষিত নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ। সর্বযুগে, সর্বকালে, সকল স্থানে এবং সকল অবস্থায় তারা এ কালাম পড়বে। সর্বস্তরের বুদ্ধি জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ কমপক্ষে এতটুকু কথা অবিশ্যি জেনে নেবে যে তাদের মহান প্রভু তাদের কাছে কি চান এবং কি চান না। বলা বাহুল্য যদি এ সমগ্র কালামের সাথে একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস ও জুড়ে দেয়া থাকতো এবং তা পাঠ করাও সবার জন্য

অপরিহার্য গণ্য করা হতো তাহলে এ কালামাকে সুবিন্যস্ত ও সুসংরক্ষিত করার পেছনে মহান আল্লাহর যে উদ্দেশ্য ছিল তা ব্যর্থ হয়ে যেতো।

আসলে কুরআনের বর্তমান বিন্যাসকে যারা আপত্তিকর মনে করেন তারা এই কিতাবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ সম্পর্কে কেবল অনবহিতই নন বরং তারা এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন বলে মনে হয় যে, এ কিতাবটি কেবল মাত্র ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

কুরআনের বর্তমান বিন্যাস সম্পর্কে পাঠকদের আর একটি কথা জেনে নেয়া উচিত। এই বিন্যাস পরবর্তীকালের লোকদের হাতে সাধিত হয়নি। বরং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই কুরআনের আয়াতগুলোকে এভাবে বিন্যস্ত ও সংযোজিত করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর চিরাচরিত নিয়ম ছিল, কোনো সূরা নাযিল হলে তিনি তখনই নিজের কোনো কাতেবকে (কুরআন লেখক) ডেকে নিতেন এবং সূরার আয়াতগুলো যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করাতেন। এরপর নির্দেশ দিতেন, এ সূরাটি অমুক সূরার পরে বা অমুক সূরার আগে বসাও। অনুরূপভাবে কখনো কুরআনের কিছু অংশ নাযিল হতো। এটাকে একটি স্বতন্ত্র সূরায় পরিণত করার উদ্দেশ্য থাকতো না। সে ক্ষেত্রে তিনি নির্দেশ দিতেন, একে অমুক সূরার অমুক স্থানে সন্নিবেশ করো। অতঃপর এই বিন্যাস অনুযায়ী তিনি নিজে নামাযেও পড়তেন। অন্যান্য সময় কুরআন মজীদ তেলাওয়াত ও করতেন। এই বিন্যাস অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম কুরআন মজীদ কণ্ঠস্থ ও করতেন। কাজেই কুরআনের বিন্যাস একটি প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য। যেদিন কুরআন মজীদের নাযিলের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায় সেদিন তার বিন্যাসও সম্পূর্ণ হয়ে যায়। যিনি এটি নাযিল করছিলেন তিনি এটি বিন্যস্তও করেন। যাঁর হৃদয়ের পরদায় এটি নাযিল করেছিলেন তাঁরই হাতে বিন্যস্তও করান। এর মধ্যে অনুপ্রবেশ বা হস্তক্ষেপ করার অধিকার ও ক্ষমতাই কারোর ছিলো না।

কুরআন কিভাবে সংকলিত হলো

যেহেতু নামায শুরু থেকেই মুসলমানদের ওপর ফরয ছিল[১] এবং কুরআন পাঠকে নামাযের একটি অপরিহার্য অংশ গণ্য করা হয়েছিল, তাই কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই মুসলমানদের মধ্যে কুরআন কণ্ঠস্থ করার

১. উল্লেখ্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের কয়েক বছর পর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হয়। কিন্তু সাধারণভাবে নামায ফরয ছিল প্রথম দিন থেকেই। ইসলামের জীবনের এমন একটি মুহূর্তও অতিক্রান্ত হয়নি যখন নামাজ ফরয হয়নি।

প্রক্রিয়াও জারী হয়ে গিয়েছিল। কুরআন যতটুকু নাযিল হয়ে যেতো মুসলমানরা ততটুকু কণ্ঠস্থও করে ফেলতো। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কাতেবদের সাহায্যে খেজুর পাতা, হাড় ও পাথর খন্ডের ওপর কুরআন লেখার যে ব্যবস্থা করেছিলেন কেবলমাত্র তার ওপর কুরআনের হেফাযত নির্ভরশীল ছিল না বরং নাযিল হবার সাথে সাথেই শত শত থেকে হাজার হাজার এবং হাজার হাজার থেকে লাখো লাখো হৃদয়ে তার নকশা আঁকা হয়ে যেতো। এর মধ্যে একটি শব্দেরও হেরফের করার ক্ষমতা কোনো শয়তানেরও ছিল না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর আরব দেশে বেশ কিছু লোক 'মুরতাদ' হয়ে গেল। তাদের দমন করা এবং একদল মুসলমানের ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার প্রবণতা রোধ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হতে হলো। এই সব যুদ্ধে এমন অনেক সাহাবা শহীদ হয়ে গেলেন যাদের সমগ্র কুরআন কণ্ঠস্থ ছিল। এ ঘটনায় হযরত উমরের (রা) মনে চিন্তা জাগলো, কুরআনের হেফাযতের ব্যাপারে কেবলমাত্র একটি মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল থাকা সংগত নয়। শুধু দিলের ওপর কুরআনের বাণী অংকিত থাকলে হবে না, তাকে কাগজের পাতায়ও সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। তদানীন্তন খলীফা হযরত আবু বকরের(রা) কাছে তিনি বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করলেন। কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করার পর তিনি তাঁর সাথে একমত হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাতেব (সেক্রেটারী) হযরত যায়েদকে(রা) এ কাজে নিযুক্ত করলেন। এজন্য যে পদ্ধতি নির্ধারণ করা হলো তা হলো এই ঃ একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব বিচ্ছিন্ন বস্তুর ওপর কুরআন লিখে গেছেন সেগুলো সংগ্রহ করা। অন্যদিকে সাহাবাদের মধ্যে যার যার কাছে কুরআনের যেসব বিচ্ছিন্ন অংশ লিখিত আছে তাদের কাছ থেকে সেগুলোও সংগ্রহ করা।[১] এই সাথে কুরআনের হাফেযদের থেকেও সাহায্য নেয়া। এই তিনটি মাধ্যমকে পূর্ণরূপে ব্যবহার

---

১. নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, রসূলের(স) জীবদ্দশায়ই বিভিন্ন সাহাবা কুরআন বা তার বিভিন্ন অংশ লিখে নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে হযরত উসমান(রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ), হযরত সালেম মাওলা হুযাইফা(রা) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেদ (রাঃ), হযরত মু'আয ইবনে জাবাল(রা), হযরত উবাই ইবনে কা'ব(রা) এবং হযরত আবু যায়েদ কায়েস ইবনিস সাকান রাদিয়াল্লাহু আনহুমের নাম পাওয়া যায়।

করে নির্ভুল হবার ব্যাপারে শতকরা একশ' ভাগ নিশ্চয়তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করার পর কুরআনের এক একটি হরফ, শব্দ ও বাক্য গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কুরআন মজীদের একটি নির্ভুল ও প্রামাণ্য সংকলন তৈরী করে উম্মুল মু'মেনীন হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে রেখে দেয়া হলো। সবাইকে তার অনুলিপি করার অথবা তার সাথে যাচাই করে নিজের পান্ডুলিপি সংশোধন করে নেয়ার সাধারণ অনুমতি দেয়া হলো।

একই ভাষা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশের বিভিন্ন শহর ও জেলার কথ্যভাষার মধ্যে যেমন পার্থক্য দেখা যায় আরবের বিভিন্ন এলাকারও গোত্রের কথ্যভাষার মধ্যেও তেমনি পার্থক্য ছিল। মক্কার কুরাইশরা যে ভাষায় কথা বলতো কুরআন মজীদ সেই ভাষায় নাযিল হয়। কিন্তু প্রথম দিকে বিভিন্ন এলাকার গোত্রের লোকদের তাদের নিজ নিজ উচ্চারণ ও বাকভংগি অনুযায়ী তা পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কারণ এভাবে পড়ায় অর্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য হতো না। কেবলমাত্র বাক্য তাদের জন্য একটু কোমল ও মোলায়েম হয়ে যেতো। কিন্তু ধীরে ধীরে ইসলাম বিস্তার লাভ করলো। আরববাসীরা নিজেদের মরুভূমির এলাকা পেরিয়ে দুনিয়ার একটি বিশাল বিস্তীর্ণ অংশ জয় করলো। অন্যান্য দেশেরও জাতির লোকেরা ইসলামের চতুঃসীমার মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলো। আরব ও অনারবের ব্যাপকতর মিশ্রণে আরবী ভাষা প্রভাবিত হতে থাকলো। এ সময় আশংকা দেখা দিল, এখনো যদি বিভিন্ন উচ্চারণ ও বাকরীতিতে কুরআন পড়ার অনুমতি অব্যাহত রাখা হয়, তাহলে এর ফলে নানা ধরনের ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। যেমন, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে অপরিচিত পদ্ধতিতে কুরআন পড়তে শুনে সে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কুরআনে বিকৃতি সাধন করেছে বলে তার সাথে বিরোধে ও সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। অথবা এই শাব্দিক পার্থক্য ধীরে ধীরে বাস্তব বিকৃতির দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। অথবা আরব অনারবের মিশ্রণের ফলে যেসব লোকের ভাষা বিকৃত হবে তারা নিজেদের বিকৃত ভাষা অনুযায়ী কুরআনের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে তার বাক সৌন্দর্যের বিকৃতি সাধন করবে। এ সমস্ত কারণে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামদের সাথে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় একমাত্র হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে লিখিত কুরআন মজীদের নোসখা

(অনুলিপিই) চালু করা হবে। এ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত উচ্চারণ ও বাকরীতিতে লিখিত নোস্‌খার প্রকাশ ও পাঠ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে।

আজ যে কুরআন মজীদটি আমাদের হাতে আছে সেটি হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) নোস্‌খার অনুলিপি। এই অনুলিপিটি হযরত উসমান (রা) সরকারী ব্যবস্থাপনায় সারা দুনিয়ার দেশে দেশে পাঠিয়েছিলেন। বর্তমানেও দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে কুরআনের সেই প্রামাণ্য নোস্‌খাগুলো পাওয়া যায়। কুরআন মজীদ সঠিকভাবে সংরক্ষিত হবার ব্যাপারে যদি কারোর মনে সামান্যতমও সংশয় থাকে তাহলে মানসিক সংশয় দূর করার জন্য তিনি পশ্চিম আফ্রিকায় গিয়ে সেখানকার কোন বই বিক্রেতার দোকান থেকে এক খন্ড কুরআন মজীদ কিনে নিতে পারেন। তারপর সেখান থেকে চলে আসতে পারেন ইন্দোনেশিয়ার জাভায়। জাভার কোনো হাফেযের মুখে কুরআনের পাঠ শুনে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে কেনা তাঁর হাতের নোস্‌খাটির সাথে তা মিলিয়ে দেখতে পারেন। অতঃপর দুনিয়ার বড় বড় গ্রন্থাগারগুলোয় হযরত উসমানের (রা) আমল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্তকার যতগুলো কুরআনের নোস্‌খা রক্ষিত আছে সবগুলোর সাথে সেটি মিলাতে পারেন। তিনি যদি তার মধ্যে কোনো একটি হরফ বা নোক্‌তার পার্থক্য দেখতে পান তাহলে সারা দুনিয়াকে এই অভিনব আবিষ্কারের খবরটি জানানো তাঁর অবশ্যি কর্তব্য। কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহকারী সন্দেহ করতে পারেন। কিন্তু যে কুরআনটি আমাদের হাতে আছে সেটি সামান্যতম হেরফের ও পরিবর্তন ছাড়াই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে কুরআনটি নাযিল হয়েছিল এবং যেটি তিনি দুনিয়ার সামনে পেশ করেছিলেন তারই হুবহু অনুলিপি, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য। এমন অকাট্য সাক্ষ-প্রমাণ সম্বলিত সত্য দুনিয়ার ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। এরপরও যদি কেউ এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন তাহলে বলতে হয়, দুনিয়ায় কোনো কালে রোমান সাম্রাজ্য বলে কোনো সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল এবং মোগল রাজবংশ কোনো দিন ভারত শাসন করেছেন অথবা দুনিয়ায় নেপোলিয়ান নামক কোনো ব্যক্তি ছিলেন-এ ব্যাপারেও তিনি অবশ্যি সন্দেহ পোষণ করবেন। এ ধরনের ঐতিহাসিক সত্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা জ্ঞানের নয়, বরং অজ্ঞতারই প্রমাণ।

কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি

কুরআন একটি অসাধারণ গ্রন্থ। দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ অসংখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে কুরআনের দিকে এগিয়ে আসে। এদের সবার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে কোনো পরামর্শ দেয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এই বিপুল সংখ্যক অনুসন্ধানীদের মধ্যে যারা একে বুঝতে চান এবং এ কিতাবটি মানুষের জীবন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের ভূমিকা পালন করে এবং তাকে কিভাবে পথ দেখায় এ কথা জানতে চান আমি কেবল তাদের ব্যাপারেই আগ্রহী। এই ধরনের লোকদের কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আমি এখানে কিছু পরামর্শ দেবো। আর এই সংগে সাধারণত লোকেরা এ ব্যাপারে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তারও সমাধান করার চেষ্টা করবো।

কোনো ব্যক্তি কুরআনের ওপর ঈমান রাখুন আর নাই রাখুন তিনি যদি এই কিতাবকে বুঝতে চান তাহলে সর্ব প্রথম তাঁকে নিজের মন-মস্তিষ্ককে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা ও মতবাদ এবং অনুকূল-প্রতিকূল উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চিন্তা থেকে যথাসম্ভব মুক্ত করতে হবে। এ কিতাবটি বুঝার ও হৃদয়ংগম করার নির্ভেজাল ও আন্তরিক উদ্দেশ্য নিয়ে এর অধ্যয়ন শুরু করতে হবে। যারা মনের মধ্যে বিশেষ ধরনের চিন্তাধারা পুষে রেখে এ কিতাবটি পড়েন তারা এর বিভিন্ন ছত্রের মাঝখানে নিজেদের চিন্তাধারায়ই পড়ে যেতে থাকেন। আসল কুরআনের সামান্য বাতাসটুকুও তাদের গায়ে লাগে না। দুনিয়ার যে কোনো বই পড়ার ব্যাপারেও এ ধরনের অধ্যয়ন রীতি ঠিক নয়। আর বিশেষ করে কুরআন তো এই ধরনের পাঠকদের জন্য তার অন্তর্নিহিত সত্য ও গভীর তাৎপর্যময় অর্থের দুয়ার কখনোই উন্মুক্ত করে না।

তারপর যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে ভাসাভাসা জ্ঞান লাভ করতে চায় তার জন্য সম্ভবত একবার পড়ে নেয়াই যথেষ্ট। কিন্তু যে এর অর্থের গভীরে নামতে চায় তার জন্য তো দুবার পড়ে নেয়াও যথেষ্ট হতে পারে না। অবশ্যি তাকে বার বার পড়তে হবে। প্রতি বার একটি নতুন ভংগিমায় পড়তে হবে। একজন ছাত্রের মতো পেন্সিল ও নোটবই সাথে নিয়ে বসতে হবে। জায়গা মতো প্রয়োজনীয় বিষয় নোট করতে হবে। এভাবে যারা কুরআন পড়তে প্রস্তুত হবে, কুরআন যে চিন্তা ও কর্মধারা উপস্থাপন করতে চায় তার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাটা যেন তাদের সামনে ভেসে ওঠে কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই তাদের অন্তত পক্ষে দুবার এই কিতাবটি পড়তে হবে। এই

প্রাথমিক অধ্যয়নের সময় তাদের কুরআনের সমগ্র বিষয়বস্তুর ওপর ব্যাপকভিত্তিক জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের দেখতে হবে, এই কিতাবটি কোন্ কোন্ মৌলিক চিন্তা পেশ করে এবং সেই চিন্তাধারার ওপর কিভাবে জীবন ব্যবস্থার অট্টালিকার ভিত্ গড়ে তোলে? এ সময়কালে কোনো জায়গায় তার মনে যদি কোন প্রশ্ন জাগে বা কোনো খট্‌কা লাগে, তাহলে তখনি সেখানেই সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে বরং সেটি নোট করে নিতে হবে এবং ধৈর্য সহকারে সামনের দিকে অধ্যয়ন জারী রাখতে হবে। সামনের দিকে কোথাও না কোথাও তিনি এর জবাব পেয়ে যাবেন, এরি সম্ভাবনা বেশী। জবাব পেয়ে গেলে নিজের প্রশ্নের পাশাপাশি সেটি নোট করে নেবেন। কিন্তু প্রথম অধ্যয়নের পর নিজের কোনো প্রশ্নের জবাব না পেলে ধৈর্য সহকারে দ্বিতীয় বার অধ্যয়ন করতে হবে। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি. দ্বিতীয়বার গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করার পর কালেভদ্রে কোনো প্রশ্নের জবাব অনুদঘাটিত থেকে গেছে।

এভাবে কুরআন সম্পর্কে একটি ব্যাপক দৃষ্টিভংগি লাভ করার পর এর বিস্তারিত অধ্যয়ন শুরু করতে হবে। এ প্রসংগে পাঠককে অবশ্যি কুরআনের শিক্ষার এক একটি দিক পূর্ণরূপে অনুধাবন করার পর নোট করে নিতে হবে। যেমন মানবতার কোন্ ধরনের আদর্শকে কুরআন পছন্দনীয় গণ্য করেছে অথবা মানবতার কোন্ ধরনের আদর্শ তার কাছে ঘৃণার্হ ও প্রত্যাখ্যাত–এ কথা তাকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। এই বিষয়টিকে ভালোভাবে নিজের মনের মধ্যে গেঁথে নেয়ার জন্য তাকে নিজের নোট বইতে একদিকে লিখতে হবে 'পছন্দনীয় মানুষ' এবং অন্যদিকে লিখতে হবে 'অপছন্দনীয় মানুষ' এবং উভয়ের নীচে তাদের বৈশিষ্ট ও গুণাবলী লিখে যেতে হবে। অথবা যেমন, তাকে জানার চেষ্টা করতে হবে, কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল এবং কোন্ কোন্ জিনিসকে সে মানবতার জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক গণ্য করে–এ বিষয়টিকেও সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে জানার জন্য আগের পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ নোট বইতে 'কল্যাণের জন্য অপরিহার্য বিষয় সমুহ' এবং 'ক্ষতির জন্য অনিবার্য বিষয় সমূহ' এই শিরোনাম দুটি পাশাপাশি লিখতে হবে। অতঃপর প্রতিদিন কুরআন অধ্যয়ন করার সময় সংশ্লিষ্ট বিষয় দুটি সম্পর্কে নোট করে যেতে

হবে। এ পদ্ধতিতে আকিদা-বিশ্বাস, চরিত্র-নৈতিকতা, অধিকার, কর্তব্য, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন, দলীয় সংগঠন–শৃংখলা, যুদ্ধ, সন্ধি এবং জীবনের অন্যান্য বিষয়াবলী সম্পর্কে কুরআনের বিধান নোট করতে হবে এবং এর প্রতিটি বিভাগের সামগ্রিক চেহারা কি দাঁড়ায়, তারপর এসবগুলিকে এক সাথে মিলালে কোন্ ধরনের জীবন চিত্র ফুটে ওঠে, তা অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে।

আবার জীবনের বিশেষ কোনো সমস্যার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে হলে এবং সে ব্যাপারে কুরআনের দৃষ্টিভংগি জানতে হলে সেই সমস্যা সম্পর্কিত প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। এই অধ্যয়নের মাধ্যমে তাকে সংশ্লিষ্ট সমস্যার মৌলিক বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে জেনে নিতে হবে। মানুষ আজ পর্যন্ত সে সম্পর্কে কি কি চিন্তা করেছে এবং তাকে কিভাবে অনুধাবন করেছে? কোন্ কোন্ বিষয় এখনো সেখানে সমাধানের অপেক্ষায় আছে? মানুষের চিন্তার গাড়ি কোথায় গিয়ে আটকে গেছে? এই সমাধানযোগ্য সমস্যা ও বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে। কোনো বিষয় সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভংগি জানার এটিই সবচেয়ে ভালো ও সুন্দর পথ। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, এভাবে কোনো বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করতে থাকলে এমন সব আয়াতের মধ্যে নিজের প্রশ্নের জওয়াব পাওয়া যাবে যেগুলো ইতিপূর্বে কয়েকবার পড়া হয়ে থাকলেও এই তত্ত্ব সেখানে লুকিয়ে আছে একথা ঘুর্ণাক্ষরেও মনে জাগেনি।

কুরআনের প্রাণসত্তা অনুধাবন

কিন্তু কুরআন বুঝার এই সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে কাজ করার বিধান ও নির্দেশ নিয়ে কুরআন এসেছে কার্যত ও বাস্তবে তা না করা প্রর্যন্ত কোনো ব্যক্তি কুরআনের প্রাণসত্তার সাথে পুরোপুরি পরিচিত হতে পারে না। এটা নিছক কোনো মতবাদ ও চিন্তাধারার বই নয়। কাজেই আরাম কেদারায় বসে বসে এ বইটি পড়লে এর সব কথা বুঝতে পারা যাবার কথা নয়। দুনিয়ায় প্রচলিত ধর্ম চিন্তা অনুযায়ী এটি নিছক একটি ধর্মগ্রন্থও নয়। মাদ্রাসায় ও খানকায় বসে এর সমস্ত রহস্য ও গভীর তত্ত্ব উদ্ধার করাও সম্ভব নয়। শুরুতে ভূমিকায় বলা হয়েছে, এটি একটি দাওয়াত ও আন্দোলনের কিতাব। সে এসেই এক নীরব প্রকৃতির সৎ ও সত্যনিষ্ঠ

ব্যক্তিকে নির্জন ও নিঃসংগ জীবন ক্ষেত্র থেকে বের করে এনে আল্লাহ বিরোধী দুনিয়ার মোকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তার কণ্ঠে যুগিয়েছে বাতিলের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ধ্বনি। যুগের কুফরী, ফাসেকী ও ভ্রষ্টতার পতাকাবাহীদের বিরুদ্ধে তাকে প্রচন্ড সংঘাতে লিপ্ত করেছে। সচ্চরিত্র সম্পন্ন সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে প্রতিটি গৃহাভ্যন্তর থেকে খুঁজে বের করে এনে সত্যের আহ্বায়কের পতাকাতলে সমবেত করেছে। দেশের প্রতিটি এলাকার ফিতনাবাজ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে সত্যানুসারীদের সাথে তাদের যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে। এক ব্যক্তির আহ্বানের মাধ্যমে নিজের কাজ শুরু করে খিলাফতে ইলাহীয়ার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পূর্ণ তেইশ বছর ধরে এই কিতাবটি এই বিরাট ও মহান ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেছে। হক ও বাতিলের এই সুদীর্ঘ ও প্রাণান্তকর সংঘর্ষকালে প্রতিটি মনযিল ও প্রতিটি পর্যায়েই সে একদিকে ভাংগার পদ্ধতি শিখিয়েছে এবং অন্যদিকে পেশ করেছে গড়ার নকশা। এখন বলুন, যদি আপনি ইসলাম ও জাহেলিয়াত এবং দ্বীন ও কুফরীর সংগ্রামে অংশগ্রহণই না করেন, যদি এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মনযিল অতিক্রম করার সুযোগই আপনার ভাগ্যে না ঘটে, তাহলে নিছক কুরআনের শব্দগুলো পাঠ করলে তার সমুদয় তত্ত্ব আপনার সামনে কেমন করে উদঘাটিত হয়ে যাবে? কুরআনকে পুরোপুরি অনুধাবন করা তখনই সম্ভব হবে যখন আপনি নিজেই কুরআনের দাওয়াত নিয়ে উঠবেন, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার কাজ শুরু করবেন এবং এই কিতাব যেভাবে পথ দেখায় সেভাবেই পদক্ষেপ নিতে থাকবেন। একমাত্র তখনই কুরআন নাযিলের সময়কালীন অভিজ্ঞতাগুলো আপনি লাভ করতে সক্ষম হবেন। মক্কা, হাবৃশা (বর্তমান ইথিয়োপিয়া) ও তায়েফের মনযিলও আপনি দেখবেন। বদর ও ওহোদ থেকে শুরু করে হুনাইন ও তাবুকের মনযিলও আপনি দেখবেন। বদর ও ওহোদ থেকে শুরু করে হুনাইন ও তাবুকের মনযিলও আপনার সামনে এসে যাবে। আপনি আবু জেহেল ও আবু লাহাবের মুখোমুখি হবেন। মুনাফিক ও ইহুদিদের সাক্ষাতও পাবেন। ইসলামের প্রথম যুগের উৎসর্গীত প্রাণ মুমিন থেকে নিয়ে দুর্বল হৃদয়ের মুমিন পর্যন্ত সবার সাথেই আপনার দেখা হবে। এটা এক ধরনের 'সাধনা'। একে আমি বলি "কুরআনী সাধনা"। এই সাধনা পথে ফুটে ওঠে এক অভিনব দৃশ্য। এর যতগুলো মনযিল অতিক্রম করতে থাকবেন তার

প্রতিটি মনযিলে কুরআনের কিছু আয়াত ও সূরা আপনা আপনি আপনার সামনে এসে যাবে। তারা আপনাকে বলতে থাকবে–এই মনযিলে তারা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সেখানের জন্যে এই বিধানগুলো এনেছিল। সে সময় অভিধান, ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রীয় কিছু তত্ত্ব সাধকের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যেতে পারে, কিন্তু কুরআন নিজের প্রাণসত্তাকে তার সামনে উন্মুক্ত করতে কার্পণ্য করবে, এমনটি কখনো হতে পারে না।

আবার এই সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের বিধানসমূহ, তার নৈতিক শিক্ষাবলী, তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিধি বিধান এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে তার প্রণীত নীতি-নিয়ম ও আইনসমূহ বুঝতে পারবে না যতক্ষণ না সে বাস্তবে নিজের জীবনে এগুলো কার্যকর করে দেখবে। যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনের অনুসৃতি নেই সে তাকে বুঝতে পারবে না। আর যে জাতির সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান কুরআন বিবৃত পথ ও কর্মনীতির বিপরীত দিকে চলে তার পক্ষেও এর সাথে পরিচিত হওয়া সম্ভবপর নয়।

কুরআনী দাওয়াতের বিশ্বজনীনতা

কুরআন সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে পথ দেখাবার দাবী নিয়ে এগিয়ে এসেছে, একথা সবাই জানে। কিন্তু কুরআন পড়তে বসেই কোনো ব্যক্তি দেখতে পায়, সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নাযিল হবার সমকালীন আরববাসীদেরকে লক্ষ করেই তার বক্তব্য পেশ করেছে। তবে কখনো কখনো মানব জাতি ও সাধারণ মানুষকেও সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে এমন সব কথা বলে যা আরববাসীদের রুচি-অভিরুচি, আরবের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, ইতিহাস ও রীতি-নীতির সাথেই সম্পর্কিত। এসব দেখে এক ব্যক্তি চিন্তা করতে থাকে, সমগ্র মানব জাতিকে পথ দেখাবার জন্য যে কিতাবটি অবতীর্ণ হয়েছিল তার মধ্যে সাময়িক, স্থানীয় ও জাতীয় বিষয়বস্তু ও উপাদান এত বেশী কেন? এ বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন না করার কারণে অনেকের মনে সন্দেহ জাগে। তারা মনে করেন, সম্ভবত এ কিতাবটি সমকালীন আরববাসীদের সংশোধন ও সংস্কারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী কালে জোরপূর্বক টানা হেঁচড়া করে তাকে চিরন্তনভাবে সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবন বিধান গণ্য করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি নিছক অভিযোগ হিসেবে নয় বরং বাস্তবে কুরআন বুঝার জন্য এ ধরনের অভিযোগ আনেন তাকে আমি একটি পরামর্শ দেবো। প্রথমে

কুরআন পড়ার সময় সেই সমস্ত স্থানগুলো একটু দাগিয়ে রাখুন যেখানে কুরআন কেবল মাত্র আরবদের জন্য এবং প্রকৃত পক্ষে স্থান, কাল ও সময় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এমন আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা বা ভাবধারা অথবা নৈতিক বিধান বা কার্যকর নিয়ম কানুন উপস্থাপন করেছে। কুরআন একটি বিশেষ স্থানে একটি বিশেষ যুগের লোকদের সম্বোধন করে তাদের মুশরিকী বিশ্বাস ও রীতি-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং তাদেরই আশে পাশের জিনিসগুলোকে ভিত্তি করে তওহীদের পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ দাঁড় করায়- নিছক এতটুকু কথার ভিত্তিতে কুরআনের দাওয়াত ও তার আবেদন স্থানীয় ও সাময়িক, এ কথা বলা যথেষ্ট হবে না। এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে, শিরকের প্রতিবাদে সে যা কিছু বলে তা কি দুনিয়ার অন্যান্য প্রতিটি শিরকের ব্যাপারে ঠিক তেমনিভাবে খাপ খেয়ে যায় না যেমন আরবের মুশরিকদের শিরকের সাথে খাপ খেয়ে গিয়েছিল? সেই একই যুক্তি প্রমাণগুলোকে কি আমরা প্রতিটি যুগের ও প্রতিটি দেশের মুশরিকদের চিন্তা পরিশুদ্ধি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি না? আর তওহীদের প্রমাণ ও তার প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনী প্রমাণ পদ্ধতিকে কি সামান্য রদবদল করে সব সময় ওসব জায়গায় কাজে লাগানো যেতে পারে না? জবাব যদি ইতিবাচক হয়ে থাকে, তাহলে একটি বিশ্বজনীন শিক্ষা কেবল মাত্র একটি বিশেষ কালে একটি বিশেষ জাতিকে সম্বোধন করে দান করা হয়েছিল বলেই তাকে স্থানীয় ও সাময়িক বলার কোনো কারণই থাকতে পারে না। দুনিয়ার এমন কোন দর্শন, জীবন-ব্যবস্থা ও চিন্তা দর্শন নেই যার প্রথম থেকে নিয়ে শেষ অবধি সমস্ত কথাই বস্তু নিরপেক্ষ (Abstract) বর্ণনা ভংগিতে পেশ করা হয়েছে। বরং কোনো একটি বিশেষ অবস্থা বা পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে তার ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। এ ধরনের পূর্ণ বস্তু নিরপেক্ষতা সম্ভব নয়। আর সম্ভব হলেও তা নিছক কাজীর গরুর মতো খাতাপত্রেই থাকবে, গোয়ালে তার নাম নিশানাও দেখা যাবে না। কাজেই মানুষের জীবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে তার পক্ষে কোনো বাস্তব বিধানের রূপ নেয়া কোনো দিনই সম্ভব হবে না।

তা ছাড়া কোনো চিন্তামূলক, নৈতিক, আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্প্রসারিত করতে চাইলে তার জন্য আদৌ এর কোন প্রয়োজন নেই। বরং যথার্থই বলতে হয়, শুরু থেকেই তাকে আন্তর্জাতিক বানাবার চেষ্টা করা তার জন্য কল্যাণকরও নয়। আসলে তার জন্য সঠিক

ও বাস্তবসম্মত পন্থা একটিই। এই আন্দোলনটি যেসব চিন্তাধারা, মতবাদ ও মূলনীতির ভিত্তিতে মানুষের জীবনের ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাকে পূর্ণ শক্তিতে সেই দেশেই পেশ করতে হবে যেখান থেকে তার দাওয়াতের সূচনা হয়েছে। সেই দেশের লোকদের মনে এই দাওয়াতের তাৎপর্য অংকিত করে দিতে হবে, যাদের ভাষা, স্বভাব, প্রকৃতি, অভ্যাস ও আচরণের সাথে আন্দোলনের আহ্বায়ক নিজে সুপরিচিতি। তারপর তাঁকে নিজের দেশেই ঐ মূলনীতিগুলো বাস্তবায়িত করে তার ভিত্তিতে একটি সফল জীবনব্যবস্থা পরিচালনার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে আদর্শ স্থাপন করতে হবে। তবেই তো দুনিয়ার অন্যান্য জাতিরা তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে তাকে অনুধাবন করতে ও নিজের দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবে। কাজেই কোনো চিন্তা ও কর্মব্যবস্থাকে প্রথমে শুধুমাত্র একটি জাতির সামনে পেশ করা হয়েছিল এবং কেবলমাত্র তাদেরকেই বুঝাবার ও নিশ্চিন্ত করার জন্য যুক্তি প্রদর্শনের পূর্ণশক্তি নিয়োগ করা হয়েছিল বলেই তা নিছক একটি জাতীয় দাওয়াত ও আন্দোলন-একথা বলার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে একটি জাতীয় ও একটি আন্তর্জাতিক এবং একটি সাময়িক ও একটি চিরন্তন ব্যবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার বিশেষত্বগুলোকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে ঃ জাতীয় ব্যবস্থা হয় একটি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব, আধিপত্য বা তার বিশেষ অধিকারসমূহের দাবীদার। অথবা তার নিজের মধ্যে এমন কিছু নীতি ও মতাদর্শ থাকে যা অন্যান্য জাতির মধ্যে ঠাঁই পেতে পারে না। বিপরীত পক্ষে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় সকল মানুষের মর্যাদা হয় সমান, তাদের অধিকার দিতেও সে প্রস্তুত হয় এবং তার নীতিগুলোর মধ্যেও বিশ্বজনীনতার সন্ধান পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে একটি সাময়িক ব্যবস্থা অবশ্যি এমন কিছু নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় যে গুলো কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার সমস্ত কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। আর এর বিপরীত পক্ষে একটি চিরন্তন ব্যবস্থার নীতিগুলো সব রকমের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খেয়ে চলে। এই বৈশিষ্টগুলো দৃষ্টির সামনে রেখে যদি কোনো ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করেন বা যে বিষয়গুলোর কারণে সত্যি সত্যিই কুরআন উপস্থাপিত ব্যবস্থাকে সাময়িক বা জাতীয় হবার ধারণা পোষণ করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ হবেন, এতে সন্দেহ নেই।

পূর্ণাংগ জীবন বিধান

কুরআন সম্পর্কে একজন সাধারণ পাঠকও শুনেছেন যে, এটি একটি বিস্তারিত পথ নির্দেশনা, জীবন বিধান ও আইন গ্রন্থ। কিন্তু কুরআন পড়ার পর সেখানে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা ও বিধি-বিধানের সন্ধান সে পায় না। বরং সে দেখে নামায ও যাকাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরযও, যার ওপর কুরআন বার বার জোর দিয়েছে, তার জন্যও এখানে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিধান বিস্তারিতভাবে দান করা হয়নি। কাজেই এ কিতাবটি কোন্ অর্থে একটি পথ নির্দেশনা ও জীবন বিধান তা বুঝতে মানুষ অক্ষম হয়ে পড়ে। পাঠকের মনে এ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে।

সত্যের একটি দিক মানুষের দৃষ্টির সম্পূর্ণ আড়ালে থেকে যাওয়ার কারণেই এ ব্যাপারে যাবতীয় সমস্যা ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কেবল এই কিতাবটিই নাযিল করেননি, তিনি এই সাথে একজন পয়গম্বরও পাঠিয়েছেন। আসল পরিকল্পনাটাই যদি হতো লোকদের হাতে কেবলমাত্র একটি গৃহনির্মাণের নক্শা দিয়ে দেওয়া এবং তারপর তারা সেই অনুযায়ী নিজেদের ইমারতটি নিজেরাই বানিয়ে নেবে, তাহলে এ অবস্থায় নিঃসন্দেহে গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত ছোট বড় প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তরিত বিবরণ আমাদের হাতে দিয়ে দিতে হতো। কিন্তু গৃহ নির্মাণের নির্দেশের সাথে সাথে যখন একজন ইঞ্জিনিয়ারও সরকারীভাবে নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি ঐ নির্দেশ অনুযায়ী একটি ইমরাত ও তৈরী করে ফেলেন তখন ইঞ্জিনীয়ার ও তাঁর নির্মীত ইমারতটিকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র নকশার মধ্যে সমগ্র ছোট বড় খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত চিত্র সন্ধান করা এবং সেখানে তা না পেয়ে নকশাটার বিরুদ্ধে অসম্পূর্ণতার অভিযোগ আনা কোনোক্রমেই সঠিক হতে পারেনা। কুরআন খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত কোনো কিতাব নয়। বরং এই কিতাবে মূলনীতি ও মৌলিক বিষয়গুলোই উপস্থাপিত হয়েছে। এর আসল কাজ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার চিন্তাগত ও নৈতিক ভিত্তিগুলোর কেবল পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ সহকারে উপস্থাপনাই নয় বরং এই সংগে বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ ও আবেগময় আবেদনের মাধ্যমে এগুলোকে প্রচন্ড শক্তিশালী ও দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ করা। অন্যদিকে ইসলামী জীবনধারার বাস্তব কাঠামো নির্মাণের ব্যাপারে কুরআন মানুষকে জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত নীতি-নিয়ম

ও আইন-বিধান দান করে না বরং জীবনের প্রতিটি বিভাগের চৌহদ্দি বাতলে দেয় এবং সুস্পষ্টভাবে এর কয়েকটি কোণে নিশান ফলক গেঁড়ে দেয়। এ থেকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর গঠন ও নির্মাণ কোন্ পথে হওয়া উচিত, তা জানা যায়। এই নির্দেশনা ও বিধান অনুযায়ী বাস্তবে ইসলামী জীবনধারার কাঠামো তৈরী করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ ছিল। দুনিয়াবাসীদের সামনে কুরআন প্রদত্ত মূলনীতির ভিত্তিতে গঠিত ব্যক্তি চরিত্র এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব আদর্শ উপস্থাপন করার জন্যই তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বৈধ মত-পার্থক্য

আর একটি প্রশ্নও এই প্রসংগে সাধারণভাবে লোকদের মনে জাগে। প্রশ্নটি হচ্ছে, একদিকে কুরআন এমন সব লোকের কঠোর নিন্দা করে যারা আল্লাহর কিতাব অবতীর্ণ হবার পরও মতবিরোধ, দলাদলি ও ফেরকাবন্দির পথে প্যাড়ি জমায় এবং এভাবে নিজেদের দ্বীনকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ও খন্ডিত করে। অথচ অন্যদিকে কুরআনের বিধানের অর্থ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পরবর্তীকালের আলেমগণই নন, প্রথম যুগের ইমামগণ, তাবেঈন সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যেও বিপুল মত বিরোধ পাওয়া যায়। সম্ভবত বিধান সম্বলিত এমন একটি আয়াতও পাওয়া যাবে না যার ব্যাখ্যায় সবাই একমত হয়েছেন। তাহলে কুরআনের উল্লেখিত নিন্দা কি এঁদের ওপর প্রযোজ্য হবে? যদি এঁরা ঐ নিন্দার পাত্র না হয়ে থাকেন, তাহলে কুরআন কোন্ ধরণের মতবিরোধ ও দলাদলির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে ?

এটি একটি বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। এখানে এ ধরনের আলোচনার সুযোগ নেই। কুরআনের একজন সাধারণ পাঠক ও একজন প্রাথমিক জ্ঞানার্জনকারীর সংশয় দূর করার জন্য এখানে কেবল সামান্য একটু ইংগিত দেয়াই যথেষ্ট মনে করি। দ্বীন ও ইসলামী জীবনব্যবস্থার ক্ষেত্রে একমত এবং ইসলামী দলীয় সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ থেকেও নিছক ইসলামী বিধান ও আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে আন্তরিক মত বিরোধের প্রকাশ ঘটে কুরআন তার বিরোধী নয়। বিপরীত পক্ষে কুরআন এমন ধরনের মতবিরোধের নিন্দা করে, যার সূচনা হয় স্বার্থান্ধতা ও বক্র দৃষ্টির মাধ্যমে এবং অবশেষে তা দলাদলি ও পারস্পরিক বিরোধে পরিণত

হয়। এই দুই ধরনের মতবিরোধ মূলত একই পর্যায়ের নয় এবং ফলাফলের দিক দিয়েও উভয়ের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। কাজেই একই লাঠি দিয়ে উভয়কে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এবং উভয়ের বিরুদ্ধে একই হুকুম জারী করা উচিত নয়। প্রথম ধরনের মত বিরোধ উন্নতির প্রাণকেন্দ্র ও মানুষের জীবনে প্রাণস্পন্দন স্বরূপ। বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোকদের সমাজে এর অস্তিত্ব পাওয়া যাবেই। এর অস্তিত্বই জীবনের আলামত। যে সমাজে বুদ্ধির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে বরং যেখানে রক্তমাংসের মানুষের পরিবর্তে কাঠের মানুষেরা বিচরণ করছে একমাত্র সেখানেই এর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আর দ্বিতীয় ধরনের মতবিরোধটির ব্যাপারে সারা দুনিয়ার মানুষই জানে, যে দেশে ও যে সমাজে তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাকেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তার অস্তিত্ব স্বাস্থের নয়, রোগের আলামত। কোনো উম্মতকে সে শুভ পরিণতির দিক এগিয়ে দিতে পারেনি। এই উভয় ধরনের মতবিরোধের পার্থক্যের চেহারাটি নিম্নোক্তভাবে অনুধাবন করুন ঃ

এক ধরনের মতপার্থক্যে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের ক্ষেত্রে সমগ্র ইসলামী সমাজে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কুরআন ও সুন্নাহকে সর্বসম্মতিক্রমে বিধানের উৎস হিসেবে মেনে নেয়া হবে। এরপর দুজন আলেম কোনো অমৌলিক তথা খুঁটিনাটি বিষয়ের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অথবা দুজন বিচারক কোনো মামলার সিদ্ধান্ত দানে পরস্পরের সাথে বিরোধ করবেন, কিন্তু তাদের কেউ-ই এই বিষয়টিকে এবং এর মধ্যে প্রকাশিত নিজের মতামতকে দ্বীনের ভিত্তিতে পরিণত করবেন না। আর এই সংগে তার সাথে মতবিরোধকারীকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত ও দ্বীন বহির্ভূত গণ্য করবেন না। বরং উভয়েই নিজেদের যুক্তি ও দলীল-প্রমাণ পেশ করে নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী অনুসন্ধানের হক আদায় করে দেবেন। সাধারণ জনমত, অথবা বিচার বিভাগীয় বিষয় হলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত অথবা সামাজিক বিষয় হলে ইসলামী সমাজ সংগঠনই উভয় মতের মধ্য থেকে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করে নেবে অথবা চাইলে উভয় মতই গ্রহণ করে নেবে- এটা তাদের নির্বাচনের ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

দ্বিতীয় ধরনের মত-প্রার্থক্য করা হবে দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে। অথবা যে বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল দ্বীনের মৌলিক বিষয়

বলে গণ্য করেননি এমন কোনো বিষয়ে কোনো আলেম, সূফী, মুফতী, নীতি শাস্ত্রবিদ বা নেতা নিজে একটি মত-অবলম্বন করবেন এবং অযথা টেনে হেঁচড়ে তাকে দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে পরিণত করে দেবেন, তারপর তার অবলম্বিত মতের বিরোধী মত পোষণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দ্বীন ও মিল্লাত বহির্ভূত গণ্য করবেন। এই সংগে নিজের একটি সমর্থক দল বানিয়ে এই মর্মে প্রচারণা চালাতে থাকবেন যে, আসল উম্মতে মুসলিমা তো এই একটি দলই মাত্র, বাদবাকি সবাই হবে জাহান্নামের ভাগীদার। উচ্চকণ্ঠে তারা বলে যেতে থাকবেঃ মুসলিম হও যদি এই দলে এসে যাও, অনথায় তুমি মুসলিমই নও।

কুরআনের আলোচনায় এই দ্বিতীয় ধরনের মতবিরোধ, দলাদলি ও ফেরকাবন্দির বিরোধিতা করা হয়েছে। আর প্রথম ধরনের মতবিরোধের কতিপয় ঘটনা তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের সামনেই উপস্থাপিত হয়েছিল। তিনি এটিকে কেবল বৈধই বলেননি বরং এর প্রশংসাও করেছেন। কারণ এ মতবিরোধ প্রমান করেছিল যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে চিন্তা ভাবনা করার, অনুসন্ধান-গবেষণা চালাবার এবং সঠিকভাবে বুদ্ধি প্রয়োগ করার যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের অস্তিত্ব রয়েছে। সমাজের বুদ্ধিমান ও মেধা সম্পন্ন লোকেরা নিজেদের দ্বীন ও তার বিধানের ব্যাপারে আগ্রহী। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বীনের বাইরে নয়, তার চৌহদ্দির মধ্যেই জীবন সমস্যার সমাধান খুঁজতে তৎপর। ইসলামী সমাজ সামগ্রিকভাবে মূলনীতিতে ঐক্যবদ্ধ থেকে নিজের ঐক্য অটুট রেখে এবং নিজের জ্ঞানবান ও চিন্তাশীল লোকদের সঠিক সীমারেখার মধ্যে অনুসন্ধান চালাবার ও ইজতিহাদ করার স্বাধীনতা দান করে উন্নতি ও অগ্রগতির পথ খোলা রাখার স্বর্ণোজ্জ্বল ঐতিহ্যের পতাকাবাহী।

هٰذَا مَا عِنْدِىْ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ۔

[আমি যা সত্য মনে করলাম তা এখানে প্রকাশ করলাম, আর আসল সত্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে আছে। আমার সমস্ত নির্ভরতা একমাত্র তাঁরই ওপর এবং তাঁরই কাছে আমাকে ফিরে যেতে হবে।]

কুরআন অধ্যয়নকালে একজন পাঠকের মনে যতো রকমের প্রশ্নের উদয় হয় তার সবগুলোর জবাব দেওয়ার জন্য আমি এ ভূমিকা ফাঁদিনি। কারণ

এ প্রশ্নগুলোর মধ্যে এমন বহু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো কোনো না কোনো আয়াত বা সূরা পাঠকালে মনে জাগে। সেগুলোর জবাব তাফহীমুল কুরআনের সংশ্লিষ্ট অংশে যথাস্থানেই দেয়া হয়েছে। কাজেই এ ধরনের প্রশ্নগুলো বাদ দিয়ে আমি এখানে কেবলমাত্র এমন সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছি সামগ্রিকভাবে যা সমগ্র কুরআনের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ, শুধুমাত্র এই ভূমিকাটুকু পড়েই একে অসম্পূর্ণ হবার ধারনা নিয়ে বসে থাকবেন না। বরং সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করুন। তারপর দেখুন আপনার মনে এমন কোনো প্রশ্ন রয়েছে কি-না যার জবাব পাওয়া যায়নি অথবা জবাব যথেষ্ট বলে আপনার মনে হয়নি। এ ধরনের কোনো প্রশ্ন থাকলে গ্রন্থকারকে জানাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।*

---

*গ্রন্থকার ১৯৭৯ সালে ইন্তেকাল করেছেন। কাজেই তাঁর কাছে প্রশ্ন করার আর কোনো সুযোগই নেই। তবে আমার মনে হয় এ গ্রন্থ পাঠ করার পর পাঠকদের যদি কোথাও কোনো অতৃপ্তি থেকে যায়, তাহলে গ্রন্থকারের বিশাল সাহিত্য ভান্ডারের মধ্যে খুঁজলে তার জবাব পাওয়া যাবে। কারণ ইসলামী আন্দোলনের জন্য গ্রন্থকার যে সাহিত্য ভান্ডার সৃষ্টি করে গেছেন তার উৎস এই কুরআন এবং তাফহীমুল কুরআন। জীবনের সূচনা লগ্ন থেকে নিয়ে যেদিন থেকে তিনি কলম হাতে নিয়েছেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এই কুরআনী দাওয়াতের সম্প্রসারণের কাজই করে গেছেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্য ভান্ডার তাঁর মূর্তমান প্রতিনিধি।

—অনুবাদক